No. 165-166 May. & June. 1877.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

সচিত্র

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

৬৫-৬৬ সংখ্যা। { বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—বঙ্গাব্দ ১২৮৪ { ১৩ শ ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।
PRINTED AND PUBLISHED BY BHOOBUN MOHUN GHOSE,
AT THE EAST INDIA PRESS, No. 93, COLLEGE STREET.

মূল্য আট আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহক দিগের নিকট হইতে ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে একমাসের অধিক বিলম্ব হইলে মফঃস্বলের পত্রিকা বন্ধ হইবে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

৪। ষাণ্মাসিকের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ষাণ্মাসিকের এই দুই মাত্র সময় থাকিবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	...	...	২।০
মফঃস্বলের [ডাকমাসুল সমেত]			২॥৵০

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূ

কলিকাতার জন্য	...	...
মফঃস্বলের [ডাকমাসুল সমেত		
প্রতিখণ্ডের মূল্য	...	...
এককালে ১২ খণ্ডের মূল্য		...
ঐ	৬	...

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ দত্ত ভা সংস্কারক ও বামাবোধিনীর কার্য্যাধ পদ পরিত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ তৎপদে নি হইলেন। এক্ষণ হইতে ভারত সং রক ও বামাবোধিনী সংক্রান্ত পত্রাদি নূতন কার্য্যাধ্যক্ষের প্রেরিত হইবে।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ৯৩ নং
১২৮৩—২রা ফাল্গুন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইং বক্তৃতার বাঙ্গালা অনুবাদ পুস্তক মুদ্রিত হইয়া আমাদিগের কা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য দুই মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৬৫ সংখ্যা } বৈশাখ। ১২৮৪। { ১৩ শ ভাগ।

উপন্যাস কুললক্ষ্মী।

কুললক্ষ্মী ও হেমপ্রভা যখন বসিয়া কথা বলিতেছিল, তখন বাহির বাড়ী হইতে কে ডাকিল "বাড়ীতে কে আছেন? একখানা ডাকের চিঠী ল'ন।" কার্য্যবশতঃ কুললক্ষ্মীর পিতা ও বিমাতা অন্য বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন, বাড়ীতে কুল ও হেম ভিন্ন অন্য লোক ছিল না। কুললক্ষ্মী প্রায় এক বৎসর কাল এই বাটীতে বাস করিতেছে, কখনও ডাকে পত্র আসিতে দেখে নাই। আজ "ডাকের পত্র লও" এই বাক্যটী শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইল—যেন কোন অনির্ব্বচনীয় ভাব তাহার হৃদয় পূর্ণ করিল। কুল ব্যস্ত হইয়া হেমকে বলিল "হেম ২, শীঘ্র দেখ বাহির বাটীতে কে ডাক্‌ছে, পত্র খানি যাহাহউক নিয়ে এস, দেখি।" হেম "না দিদি! আমিত তোমার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি তোমাকে কখনও কোন চিটী পত্র আনিয়া দিতে পারবনা, এখন কেমন করে আনিব, দিদি? আমিত বড় বিপদ দেখতে পাচ্ছি যদি তোমার পত্র হয় তবে অন্য কাহার হাতে পড়লে সর্ব্বনাশ হবে। তুমি আমাকে শিখাইয়াছ যে মিথ্যা বলিলে, চুরি করিলে, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, নাহলে আমি নিশ্চয় এনে দিতাম। তুমি যদি বল তবে আমি এখনি যাব, তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি।"

কুললক্ষ্মী—" হেম, আমি তোমার কথা শুনে বড় সুখী হইলাম। তোমার পত্র এনে কাজ নাই, কিন্তু আমি এখনই পত্র আন্‌তে চল্লেম। হে ঈশ্বর! আমিও এই ঘর হইতে বাহির হইব না—বিমাতার তাড়নায় এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুর্দ্দম মন আজ আর প্রতিজ্ঞা পালন করিতে দিবে না। বিশেষতঃ জীবিতই হউক অথবা মৃত অবস্থা-তেই হউক, অচিরেই আমার এই পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে হইবে। অতএব হে প্রভু পরমেশ্বর! আমি বাহির হই, আমার পাপ ক্ষমাযোগ্য হইলে ক্ষমা করিও।" এই বলিয়া কুললক্ষ্মী বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, অল্প চেষ্টাতেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। কিন্তু দ্বারোদ্‌ঘাটিত হইলে কি হইবে, তাহার চরণই বাধা জন্মাইতে লাগিল, অনেক দিবসের পর এই বদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইতে তাহার চরণ কাঁপিতে লাগিল—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী যেমন কোন ক্রমে পিঞ্জর হইতে বাহির হইলে সহসা উড়িয়া যাইতে পারে না, কেবল ছট ফট করিতে থাকে, দুরন্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক আবার পিঞ্জরে বদ্ধ হইবার আশঙ্কায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাকে, কুললক্ষ্মীরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। অনেক কষ্টে কুল কোন মতে বাহির হইল। হেম কুলকে বাহির হইতে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া কুলর বসনাঞ্চল ধারন করিয়া তাহাকে গৃহপানে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কুললক্ষ্মী হেমকে বিরত করিয়া ধীরে ২ ডাক পিয়নের নিকট গমন করিল এবং তাহাকে বলিল "পত্র দেও।" পিয়ন দুটী বালিকার মনোহর আকৃতি এবং আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া কেবল তাহাদের কাণ্ড দেখিতে ছিল, এখন পত্র চাহাতে বলিল এই বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়? পত্র তাঁহাকে দিব।" হেম পত্র দিতে গৌণ দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল "কর্ত্তা বাড়ী এলে আমরা তাঁকে দিব, তুমি আমাদের নিকট রেখে যাও।" পিয়ন পত্রখানি কুললক্ষ্মীর হস্তে প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসিল "পত্র কাহার?" কুল শিরোনামাটী দেখিয়া একেবারে আনন্দে ও ভয়ে অভিভূতা হইয়াছিল—অতি সুকোমল স্বরে বলিল "পত্র আমার, আমি পাইলাম তুমি এখন বিদায় হও।" পিয়ন বালিকাদ্বয়কে এত ব্যস্ত দেখিয়া মনে ২ ভাবিতে ২ গমন করিল বুঝি মেয়েদুটী লেখাপড়া জানে, আহা! লেখা পড়া জানিলে বুঝি কথা বড় মিষ্ট হয়, মেয়েদুটীর কথাগুলি কি মিষ্ট!" কুল পত্রের উপর নিজনাম এবং তাহা বিনোদের হাতের লেখা

দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইল। এই-সর্ব্বনাশের সময়ে যে বিনোদের পত্র পাইল এই ভাবিয়া কুললক্ষ্মীর চক্ষু হইতে মুক্তার ন্যায় ধারা পতিত হইতে লাগিল। হেম বলিল—"ঘরে এস, শীঘ্র কেহ আসিয়া পড়্‌বে।"

কুললক্ষ্মীর শরীর তখন আনন্দ, ভয়, দুঃখ বিরুদ্ধ ভাবসমূহের আতিশয্যে একেবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, বড় শীঘ্র ২ গৃহে গমন করিতে সমর্থ হইল না। কুললক্ষ্মী যখন ঘরে প্রবেশ করিতেছিল—এক চরণ ঘরের ভিতরে অন্য চরণ দ্বারেতে বিন্যস্ত হইয়াছিল, তখন হঠাৎ তাহার বাঘিনী বিমাতা কোথা হইতে আসিয়া একেবারে কুললক্ষ্মীর হাত ধরিল এবং বলিতে লাগিল—"সর্ব্বনাশী কার পত্র নিচ্ছিস্ লো? দেখিস্ আজ তোকে কি করি। এমন কুলকলঙ্কিনী মেয়ে নিয়ে কি হবে? তুই এইদণ্ডে গলায় দড়ি কলসী বেঁধে ডুবে মর্।" এই সমস্ত সুমধুর বাণী বলিতে ২ কুললক্ষ্মীর হস্ত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইল। কুললক্ষ্মী এইভাবে ধৃত হইয়া একেবারে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, দুটী চক্ষের জলে তাহার সুকোমল গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কুললক্ষ্মীর বিমাতা হেমকেও যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া, পাড়ার সমস্ত লোক ডাকিয়া পত্র দেখাইতেছে, এমন সময় সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ী আসিলেন। তিনি আসিবা মাত্র তাঁহার পত্নী পত্রখানা তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল "দেখ তোমার আদরের মেয়ের গুণ দেখ, তোমার বিখ্যাত কুলকন্যা দ্বারা কুল উজ্জ্বল হইতেছে। সর্ব্বদা বলিয়া থাক যে আমি তোমার মেয়েকে দেখিতে পারিনা, মেয়ের কোন দোষ নাই। এখন দেখ দোষ কি গুণ?" সর্ব্বেশ্বর নিঃশব্দে পত্রখানি হাতে লইয়া পাঠ করিলেন এবং স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন "কি করিব বল, অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে? এই কন্যা দ্বারা আমার কুলমান সকল অতল জলে ডুবিল, দেখি মা জগদম্বা কি করেন।" সর্ব্বেশ্বর স্ত্রীকে আরও বলিলেন "লোককে ডাকিয়া দেখালে লাভ কি? লাভের মধ্যে শত্রু হাসিবে মাত্র।"

কুললক্ষ্মীর বিমাতা কুলকে বকিতে ২ ঘরে প্রবেশ করিল, কুলও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেল। হেম কুললক্ষ্মীর এমন দুরবস্থার সময় তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না, সঙ্গে ২ ধীরে ২ গমন করিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার বাড়ী হইতে একটী বৃদ্ধা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। কুললক্ষ্মী

পিতা মাতার তিরস্কারে এবং বিনোদ বাবুর পত্রখানি যে হাতে আসিয়াও পড়িতে পারিল না এই দুঃখে নিঃশব্দে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনোদের পত্র খানি পাইয়া কুললক্ষ্মীর নিরাশ হৃদয়ে বিদ্যুৎ বিকাশবৎ অল্পক্ষণের জন্য একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু হায়! শীঘ্র সেই আশার আলোক দুর্ভাগ্য মেঘে ঢাকিয়া গেল। কুললক্ষ্মী বিনোদের পত্র পাইয়া মনে করিয়াছিল যে বুঝি জগদীশ্বর তাহাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার কিছু উপায় করিবেন, কিন্তু যখন এইরূপে ধৃতা ও অপমানিতা হইল, তখন মনে করিল যে তাহার আর রক্ষা নাই। বিবাহের ২ দিবস মাত্র বাকী। যদি সে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তথাপি এই বিবাহের হাত এড়াইতে পারিবে না। তাহার দুরাচার নির্দ্দয় পিতা তাহাকে জোর করিয়া বিবাহ দিবেই দিবে। কুললক্ষ্মী নিরুপায় হইয়া একমাত্র জগদীশ্বরের চরণে আত্ম সমর্পণ করিল। সর্ব্বেশ্বর স্ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন "এখন কি কর্ত্তব্য? যদি কুললক্ষ্মী বিবাহ সভায় গোল করে, তবে কি হইবে, তবেত বড় লজ্জার কথা। তুমি একদিন একটু ভাল করে বুঝায়ে বল, যে বরটী খুব ভাল, অনেক গহনা পত্র দেবে।" সর্ব্বেশ্বরের পত্নী বলিলেন "যদি আমার কথা শুন, তবে আগে যাহাতে বিনোদের হতে মেয়ের মন ফিরে যায়, তাই কর, শেষে বিবাহ দাও, নয়তো ভারী লজ্জা পাবে,—তোমার যে একগুঁয়ে মেয়ে কখনও বিবাহ সভায় চুপ করে থাকবে না, নিশ্চয়ই একখানা কি কাণ্ড কর্‌বে।" সর্ব্বেশ্বর কাতর দৃষ্টে স্ত্রীর পানে চাহিয়া "আমিত মন ফিরাইবার কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, তবে তুমি যদি কিছু অষুধ টষুধ করে কিছু কর্ত্তে পার তা হলে আমার সোণার কুল বজায় থাকে, না হলে আমি একেবারে যাই।" সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী "আচ্ছা ভাবনা কি তোমার, অষুধে কি না হয়, সে দিন হারাণির মা ওবাড়ীর কামিনীর জামাইকে বশ করে দিলে না, তা এ আর কত বড় কথা যে একটী মেয়েকে বশ কর্‌বে।" সর্ব্বেশ্বর কিছুক্ষণ চিন্তার পর "আচ্ছা ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখ যেন হিতে বিপরীত না হয়, যাহাতে বিনোদ মুখোপাধ্যায়ের হতে কুলর মন ফিরে যায়, তাই কর্ত্তে বল, সাবধান যেন পাগল টাগল করে বসো না। স্ত্রী রাগান্বিতা হইয়া "তোমার কথা শুনে আমার গা জ্বলে যায়,—কত লক্ষ২ লোককে হারাণির মা অষুধ দিচ্ছে তাদের

কিছু হচ্ছে না, তোমার মেয়ে পাগল হয়ে যাবে। কি আদরের মেয়ে গা? এই আদরেই খেয়েছ?" সর্ব্বেশ্বর—"যা কর্ত্তে হয় করগে, তোমাকে আমার অবিশ্বাস নাই, তবে কি না একটা কথার কথা বল্লেম, তুমি রাগ কর্বে আমি মনে করি নাই। এখন যাও যা কর্ত্তে হয় করগে।" কুললক্ষ্মীর পিতা ও বিমাতার যে কথোপকথন হইতেছিল অভাগিনী কুল তাহার কিছুই জানে না—তাহার সর্ব্বনাশের জন্য যে ভয়ানক পরামর্শ টী অবধারিত হইল, অভাগিনী বালিকাকে তাহা কে বলিবে?" বিনোদ বাবু তুমি কোথায়? তোমার জন্য একটী সরলা বালার প্রাণ যাইতেছে, একবার আসিয়া দেখ! এদিকে সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী শীঘ্র২ স্নানাহার গৃহকার্য্যাদি সমাপন করিয়া একটী মুদ্রা ও কিছু পান কাপড়ে বাঁধিয়া গোপনে হারানির মার বাড়ীতে গমন করিল।

হারানির মা পাড়ার একজন চণ্ডাল জাতীয়া দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক, বয়স ৩০। ৩৫ বৎসর, তাহার পরিবারের মধ্যে একমাত্র বিধবা যুবতী কন্যা হারাণী; ব্যবসারের মধ্যে কাহাকে ঔষধ দিয়া পাগল করা, কাহার স্বামীকে বশ করা, কাহার সপত্নীকে বিষ প্রয়োগে মারিয়া ফেলা ইত্যাদি!!! সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী এই ভীষণ-প্রকৃতি নর পিশাচীর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। মনুষ্য দেখিলেই পিশাচী আদর করিয়া বসাইত। সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রীকেও মহাসমাদরে বসাইয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিল। সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী সমস্ত কথা বিশদরূপে তাহাকে জানাইয়া মুদ্রাটী হস্তে দিয়া কহিল, "দিদি, এমন অষুধ দিবি যেন এক দিনের মধ্যে মন ফিরে যায়—বের কেবল ২ দিন বাকী। আমাদের জাত মান সব তোর হাতে।" দুষ্টা বলিল "আগে কেন আমার কাছে কই দিলানা, এতশীঘ্ বির অষুদ কোথেকে দিব, আযুদ খুঁজতে ২। ৩ দিনের বেশী লাগ্‌বে। কিছু কড়া অষুদ তৈয়ের আছে, তা কচি মেয়ে যদি সাম্‌লাতে না পারে তবেত আমার রক্ষে নাই।" কুললক্ষ্মীর বিমাতা "কেন পারবে না, এমন কচি কি? প্রায় ১৭। ১৮ বছরের মেয়ে হল, এটু তেজের অষুধেরই কাজ, কেননা বিবাহের দুই দিন মাত্র বাকী, এর মধ্যে যেন একেবারে মন ফিরে যায়, আমি এম্নি অষুধ চাচ্ছি; তোমাকে এখন টাকা দিচ্ছি, যদি কার্য্য সফল হয়, তবে তোমাকে খুসি

করবো।" হারানির মা 'আজ্ঞা তবে তুমি দাঁড়াও আমি কালীর নামে অষুদ দেই, মন অবশ্যই ফিরবে। অষুধটা খাইয়ে দিয়েই একটা ডাবের জল খেতে দিবে, তা হলে অষুধের তেজ কম্‌বে। আর অষুদটা ঠিক দুপুরের সময় এলো চুলে পান কিম্বা কলার সঙ্গে খাওয়াবে।"

কুললক্ষীর বিমাতা জিজ্ঞাসা করিল "অষুধ খেয়েত পাগল টাগল হয়ে যাবে না, তা হলে তোর ও আমার বড় বিপদ ঘট্‌বে।" হারাণির মা "না পাগল হবে না, তবে কিছু ভেদ টেদ বমি টমি হলেও হতে পার্‌বে। পাগল হলেই বা আমার কি? অষুধ দেবার সময় আমরা এমন প্রতিজ্ঞা করাইয়া লই, যেন মন্দ হলে আমাদের কিছু লেঠা না লাগে।" সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী "দেও অষুধ, ভাগ্যে যা থাকে তাই ঘট্‌বে; এমন মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মলেও বাঁচি; ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়!" সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী ঔষধ লইয়া বাড়ী আসিল এবং স্বামীকে ঔষধ দেখাইয়া, পর দিন দুপ্রহর বেলার সময় ঔষধ খাওয়ান ঠিক করিয়া রাখিল। (ক্রমশঃ)

পুরাণ কথা।

বিভীষণ বেশে মহীরাবণ কর্ত্তৃক রাম লক্ষ্মণ হরণ।

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে রামায়ণের 'মহীরাবণের পালা' সকলে পড়িয়াছেন কি না আমরা জানি না। যাঁহারা না পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক, রামচন্দ্রের সহিত ঘোর যুদ্ধে যখন পাপিষ্ঠ রাবণের বংশে বাতি দিবার আর কেহ রহিল না, সে একাকীমাত্র জীবিত রহিল, তখন তাহার স্মরণ হইল 'মহীরাবণ' নামক তাহার এক পুত্র পাতাল পুরীতে আছে, তাহার ন্যায় মায়াবী ত্রিজগতে নাই। রাবণ মহীরাবণকে স্মরণ করিবা মাত্র সে সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। রাবণ রাম লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া আনিবার জন্য তাহার প্রতি ভার অর্পণ করিল। মহীরাবণ যেরূপ মায়া কৌশলে পিতৃ প্রদত্ত কার্য্যভার সম্পন্ন করে, তাহা কৃত্তিবাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবন কুমার॥

আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তাঁরে নাহি দিবে হেতা॥
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ॥
রাবনে প্রণাম করি সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিলা গমন॥
ঠাট কটক হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর,।
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর॥
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
ঠাট কটক দেখি সব গড়ের ভিতরে॥
মনে মনে ভাবে মহী রাবণ নন্দন।
মায়াতে ছলিব আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বিভীষণ দেখি তথা গড়ের বাহিরে।
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে॥
মনে মনে চিন্তা মহী করিয়ে তখন।
মায়াতে হইল অজ রাজার নন্দন॥
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে শুন পবন নন্দন॥
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে করি দরশন॥
হনুমান বলে প্রভু করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ॥
হেন কালে বিভীষণ দিল দরশন।
ত্বরাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ॥
হনু বলে শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দশরথ রাজা এসে ছিলেন এখন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা॥

এতবলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়।
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়॥
ভরত হইয়া আইল হনুমান কাছে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে॥
চৌদ্দ বর্ষ বনবাসী মস্তকেতে জটা।
দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিতেছে পবন নন্দন॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ।
এত শুনি পাছে হাঁটে সে মহীরাবণ॥
হেন কালে ধাইয়া আইল বিভীষণ।
হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ॥
হনুমানে চাহি বিভীষণ কন কথা।
দ্বার না ছাড়িও যদি আইসে তব পিতা॥
এত বলি বিভীষণ গেলা অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে॥
কৌশল্যা বলেন শুন পবন কুমার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মোরে দেখাও একবার॥
হনুমান বলে মাতা করি নিবেদন।
ক্ষণেক থাকহ আগে আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে।
বিভীষণ ধাইয়া আইল তাকে দেখে॥
বিভীষণে দেখে বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি।
তাহা দেখি হনুমান দন্ত কড়মড়ি॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবন নন্দন॥
বিভীষণ বলে শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন॥

এত বলি বিভীষণ করিলা গমন।
হইয়া জনক ঋষি দিল দরশন॥
জনক বলেন শুন পবন নন্দন।
রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন॥
আমার জামতা হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গত নাহি দরশন॥
তোমারে না চিনি বলে পবন নন্দন।
ক্ষণকাল থাকহ আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া ঋষি হনুমানের বোল।
হনুমান সঙ্গেতে যুড়িল গণ্ডগোল॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেন হাঁকার।
পলায় জনক ঋষি দেখা নাহি আর॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবন নন্দন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
গড়ের ভিতরে যেতে না দিবা সর্ব্বথা॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন॥
হনুমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে আইলে কিসের কারণে॥
মহীরাবণ বলে শুন পবন নন্দন।
চোর মায়া কত জানে সে মহীরাবণ॥
সাবধানে থাক হনু আজকার নিশি।
রামর লক্ষ্মণের মাথে রক্ষা বেন্ধে আসি॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রাম লক্ষ্মণের পাশে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কোলে আছেন দুই ভাই।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাঁই॥

মহামায়া স্মরি দিল ধূলা উড়াইয়া।
রাম লক্ষ্মণ নিদ্রা যান অচৈতন্য হৈয়া॥
অচৈতন্য হয়ে পড়ে যতেক বানর।
হাতে হৈতে খসে পড়ে গাছ আর পাথর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে নিদ্রায় অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতর লয়ে রাখিল গোপনে॥
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র হাতে।
নিজ পুরে রহে মহী হরিষ মনেতে॥

আমরা রামায়ণের এই উপাখ্যানটী আর এক উদ্দেশে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠিকাগণ মনে করুন, রামলক্ষ্মণ মনুষ্যের মন, বিভীষণ বিবেক, হনুমান চিত্তের দৃঢ়তা, রাবণ পাপ, মহীরাবণ প্রলোভন। পাপ মনকে অধিকার করিবার জন্য প্রলোভন বিস্তার করে। মহীরাবণ যেমন একবার দশরথ, একবার ভরত, একবার কৌশল্যা, একবার জনক নানারূপ ধরিয়া হনুমানকে ভুলাইয়া রাম লক্ষ্মণকে হস্তগত করিতে গিয়াছিল; প্রলোভন তেমনি অত্যন্ত আত্মীয়ের বেশে মনের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া মনকে বশীভূত করিতে চায়। বিবেকের চক্ষুকে কিন্তু প্রলোভনের কোন মূর্ত্তি ঠকাইতে পারে না। বিবেক আমাদিগের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। বিবেক জাগ্রৎ থাকিলে তাহার চক্ষে পড়িবা মাত্র প্রলোভন সকল ধরা পড়ে এবং পলাইয়া যায়। কিন্তু প্রলোভন যে কত মায়া জানে, তাহা মনুষ্যের জ্ঞানের অগম্য। মহীরাবণ যেমন কোন উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বিভীষণের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিল, প্রলোভন সেইরূপ কোন আকার ধারণ করিয়া মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে অবশেষে বিবেকের মূর্ত্তি ধরিয়া আইসে। মন যত দৃঢ় হউক প্রলোভনকে বিবেকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতে দেখিলে তখনি পথ ছাড়িয়া দেয়। প্রলোভন পথ পাইলেই মনকে জিনিয়া বসে এবং গুপ্তপথ দিয়া তাহাকে আপনার রাজ্যে লইয়া গিয়া প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখে, মন আর প্রলোভন চক্র এড়াইতে পারে না। কত শত উন্নতচিত্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধন, মান, সুখ, প্রভুত্ব

প্রভৃতি কত প্রলোভনের ছলনা বীর পরাক্রমে কাটিয়াছেন, কিন্তু শেষে পাপ ইচ্ছাকে কর্ত্তব্য বলিয়া যাই মনে করিয়াছেন, অমনি অসতর্ক হইয়া প্রলোভনের হস্তে পড়িয়াছেন এবং পাপে জড়িত হইয়াছেন। কোন দুষ্প্রবৃত্তি বিবেকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিলে পাপ হইতে আর রক্ষা নাই, এই জন্য প্রলোভনকে প্রলোভন বলিয়া চিনিবার জন্য যথার্থ বিবেককে সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বল রাখা কর্ত্তব্য। যথার্থ বিভীষণ নিকটে থাকিলে আর কি মহীরাবণ বিভীষণ বেশ ধরিয়া হনুমানকে ঠকাইতে পারিত? যথার্থ বিবেক সহায় থাকিলে বিবেক-বেশী প্রলোভন কি আর মনকে জয় করিতে পারে? যাহাহউক পুরাণে বর্ণিত আছে হনুমানই আবার মহীরাবণের পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাম লক্ষণকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল। প্রলোভনের রাজ্যে পতিত হইলেও মনের দৃঢ়তা দ্বারা প্রলোভন বিনষ্ট করিয়া আত্মাকে পুণ্যের পথে পুনরুদ্ধার করা যায়।

পিপীলিকা।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র জীব এবং সচরাচর আমরা ইহাকে দেখিয়া থাকি, তাহা বলিয়া ইহাকে সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। এই জন্তুদিগের সমাজ বদ্ধতা, শাসনপ্রণালী, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, পরিণাম দর্শিতা এবং মিতব্যয়িতা প্রভৃতি মহৎ গুণ সকল যত আলোচনা করা যায়, ততই আশ্চর্য্য হইতে হয়, তাহা হইতে মনুষ্য অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

পিপীলিকা সকল নানা বর্ণের, কাল, পাঁশুটে, লাল, পাটল এবং বিমিশ্র বর্ণেরও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের আকারও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নানাবিধ। ইহাদিগের কতকগুলির হুল আছে, কতকগুলির নাই। যাহাদিগের হুল আছে, শত্রুকে ফুটাইয়া দেয়; যাহাদিগের নাই তাহারা শরীরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস বাহির করে তাহা স্পর্শ মাত্র চর্ম্ম যেন সূচের দ্বারা বিদ্ধ হইতে বা পোড়ার মত জ্বলিতে থাকে। পিপীলিকারা গৃহ পরিষ্কারের কার্য্য করে, আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। যে গৃহে ইহাদিগের আধিক্য সেখানে উকুন, ছারপোকা প্রভৃতি কীট তিষ্ঠিতে পারে না। ইহারা বৃক্ষ সকলকে অনিষ্টকারক পোকা হইতে রক্ষা করে।

পিপীলিকার শরীর ৩ খণ্ডে বিভক্ত, মস্তক, বক্ষ ও উদর। মাথায় কাল কাল চক্ষু, তাহার নিম্নে দুটী ছোট শিঙ বা শুঁড়। ইহার এক একটীয় ১২টী করিয়া গাঁইট আছে এবং তাহার চারিদিক রেসমের ন্যায় কোমল লোমে আবৃত। মুখে দুটী বক্র চোয়াল বাহির হইয়া আছে, প্রত্যেকে ছেদক দন্ত আছে। বক্ষস্থল সূক্ষ্ম ২ রেসমী লোমে আচ্ছাদিত, তাহা হইতে ৬ খানি পা বহির্গত হইয়াছে। পা গুলি শক্ত ও লোমাবৃত। প্রত্যেক পার অগ্রভাগে দুটী করিয়া থাবা আছে, তদ্দারা এই জন্তুর আরোহণ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। উদর অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা ঘোরাল রঙের, কাচের ন্যায় চকচকে এবং অতি সূক্ষ্ম লোমে আবৃত।

ইউরোপ খণ্ডে পিপীলিকারা উইয়ের ঢিবির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ ঢিবি নির্ম্মাণ করে এবং দারুণ শীতকালে তাহার মধ্যে নিদ্রা যায়। শীতের অবসান হইবা-মাত্র তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং ঢিবির নিকট থিক থিক করিতে থাকে। তাহারা জাগ্রত হইয়া প্রথম দিন কোথাও যায় না, শীতের অত্যাচারে তাহা-দিগের গৃহের কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য যেন গৃহের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া দেখিতে থাকে এবং পর দিন কি কার্য্য করিবে তাহা পরামর্শ করিয়া স্থির করে।

পিপীলিকাদিগের মধ্যে পতত্রহীন দল প্রথমে ঢিবী হইতে বাহির হয়, ইহারাই শ্রমজীবী পিপীলিকা ও নপুংসক। পুরুষ এবং স্ত্রী জাতীয় পিপীলিকারা অনেক দিন পরে বহির্গত হয়। তাহাদিগের শরীর ৪টী করিয়া ডানা দ্বারা সজ্জিত। মৌমাছিদিগের ন্যায় পিপীলিকারা স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদিগকে পরস্পর হইতে অনায়াসে পৃথক্ করা যায়। স্ত্রী জাতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, শ্রমজীবী নপুংসক পিপী-লিকারা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয়দিগের পাখা থাকে, কখন কখন না থাকিতেও পারে, কিন্তু নপুংসক পিপীলিকাদিগের পাখা কখনই উৎপন্ন হয় না। স্ত্রী পিপীলিকার বক্ষঃস্থল পুরুষের অপেক্ষা কটা বর্ণ এবং অধিক উজ্জ্বল।

ইংলণ্ডে পিপীলিকার ঢিবি সকল তত সুদৃশ্য নয়। ইউরোপের দক্ষিণস্থ অনেক দেশে তাহাদিগের গৃহের পারিপাট্য দেখিলে যার পর নাই আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেখানে বৃহৎ বৃক্ষ বা জলস্রোত থাকে, পিপীলিকারা তাহার

নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করে। বৃক্ষ হইতে তাহারা আহার পায়, নদী হইতে জলের অভাব পূর্ণ করে। পিপীলিকার গৃহ আকারে চিনির নৈবেদ্যের ন্যায় এবং উচ্চে দুই হাত। ইহা পাতা, কাষ্ঠখণ্ড, বালুকা, মৃত্তিকা, আটা এবং তৃণে নির্ম্মিত। এই সকল পদার্থ এরূপে মিশ্রিত যে পৃথক করা যায় না। গৃহ ছিদ্র পূর্ণ এবং তাহার মধ্যে অসংখ্য কুঠারি ও বক্র পথ আছে। বৃক্ষ এবং নদীতে যাইবার জন্যও চারিদিকে পথ প্রসারিত হইয়াছে। এই সকল পথ দিয়া পিপীলিকাদিগকে ক্রমাগত যাতায়াত করিতে দেখা যায়। বৈশাখ হইতে তাহারা ক্রমাগত পরিশ্রম করে এবং শীতাগমে পরিশ্রমে নিবৃত্ত হয়।

শ্রমজীবী পিপীলিকারা নানা স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আপনারা আহার করে এবং গৃহের অলস জীবদিগকে পালন করে। ইহারা উদ্ভিদ্ ও আমিষ উভয়ই ভক্ষণ করে। ইহারা ছোট ছোট পোকা মারে ও খায় এবং সকল প্রকার মিষ্ট দ্রব্যে অত্যন্ত পরিতুষ্ট। কিন্তু আপনাদিগের পেট না ভরিলে পরিজনগণের জন্য কিছু আনে না। একটী মিষ্ট ফল পাইলে তাহারা যত দূর পারে উদরপূর্ণ করিয়া খায়, তৎপরে অবশিষ্ট খাদ্য টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া গৃহে বহিয়া লইয়া যায়। যদি তাহারা কোন ভারী বস্তু দেখিতে পায়, এবং খণ্ড খণ্ড করিতে না পারে, অনেকগুলি একত্র হইয়া টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, কতকগুলি টানে এবং কতকগুলি ঠেলিয়া দেয়। এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে যদি কোন পিপীলিকা মরিয়া যায়, তাহাকে দেখিয়া পাছে অন্য সকলের শ্রমপ্রবৃত্তি শিথিল হয়, এই জন্য কয়েক জন তাহাকে ধরিয়া বহু দূরে প্রক্ষেপ করিয়া আইসে। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা মৃত দেহ গোর দেয় বলিয়া যে গল্প আছে, তাহার মূল এই।

সন্তানদিগের প্রতি পিপীলিকাদিগের যে কত স্নেহ, বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যখন কোন দুর্ঘটনা বা বিপৎপাতের আশঙ্কা হয়, পিপীলিকা-গণ তাহাদিগের ডিম্ব সকল মুখে করিয়া ছুটীতে থাকে, এক এক সময় দলে দলে ক্রমাগত ডিম্ব সকল বহিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। শীতকালে ডিম্ব সকলের প্রতি অত্যন্ত যত্ন প্রদর্শন করে। তাহাদিগের বাস

গহ্বরের নিম্নতম যে সকল স্থান, সেই থানে ইহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করে। ভাল দিন দেখিলে ডিম্ব সকল মুখে করিয়া গহ্বরের মুখের নিকট রাখে, উত্তাপে তাহারা শীঘ্র ফুটিবে এই উদ্দেশ্য। কোন দুর্দ্দান্ত জন্তু আসিয়া যদি তাহাদিগের বাসা ভাঙ্গিতে থাকে এবং সব চুরমার করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে থাকে, তথাপি পিপীলিকারা অপত্যস্নেহ বিস্মৃত হয় না। তাহারা সর্ব্বাগ্রে ডিম্ব ও শাবক সকল রক্ষা করিবার চেষ্টা পায়। প্রত্যেকে আপনাদিগের শরীর অপেক্ষাও বৃহদাকৃতি এক এক ডিম্ব মুখে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে ছুটিতে থাকে।

পিপীলিকার ডিম্ব পুষ্টি পাইলে শাবকের বুক ফুলিয়া উঠে, ইহা আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং সম্পূর্ণ স্পন্দহীন হয়। তখন প্রচ্ছন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি এক এক করিয়া বাহির হইতে থাকে। তথাপি গুটি পোকার ন্যায় নিস্পন্দ থাকে। পিপীলিকা শাবক আকার পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়া পূর্ণাবয়ব হইলে শরীর ঢাকা চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং স্বজাতীয় পিপী-লিকা আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ কার্য্যও শাবকের একার চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হয় না, বৃদ্ধ পিপীলিকারা দন্ত দ্বারা আবরণ ছিঁড়িয়া দেয়। কেবল ইহাই নয়, ঠিক উপযুক্ত সময় ইহারা জানিয়া শাবককে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। এই সময়টী নিরূপণ করা নিতান্ত আবশ্যক। সময়ের অগ্রে হইলে শাবকসকল শীতে মরিয়া যায় এবং সময় বহিয়া গেলে বদ্ধ অবস্থায় তাহারা হাঁপাইয়া মরিতে পারে।

ডিম্ব প্রসব করিলে এবং ডিম্ব সকল ফুটিয়া গেলে স্ত্রী পিপীলিকাদিগের কার্য্য শেষ হয়। তখন তাহাদের পাখাসকলও পড়িয়া যায়। পাখা পড়িয়া গেলে ইহাদিগের অবস্থা কিরূপ হয় ঠিক জানা যায় নাই। শাবক উৎপাদন কার্য্য শেষ হইলে পুরুষদিগকেও আর কোন পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহারা পতত্রে ভর দিয়া উড়িয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না। বোধ হয় পিপীলিকা-প্রিয় পক্ষী-দিগের দ্বারা তাহারা ভক্ষিত হইয়া থাকে অথবা শীতে মরিয়া যায়। শ্রমজীবী পিপীলিকারা তাহাদিগের রানী সকলকে পদচ্যুত করিয়া মাটীর যত নিম্নে পারে লুকাইয়া থাকে এবং নিদারুণ শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে।

পিপীলিকারা শীতপ্রধান দেশে শীত কয়েক মাস তাহাদিগের ঢিবির

মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় বাস করে, আমাদিগের দেশে তাহারা প্রায় বর্ষাকালে গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করে। কিন্তু যতদিন সুসময় থাকে, ততদিন তাহাদিগের পরিশ্রম অবিশ্রান্ত। তাহারা যেখানে যা পায়, তাহাই লইয়া ভাণ্ডার যাত করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের অসময়ের সুসার হইয়া থাকে। সুখের দিনে সব সুখ ভোগ করিয়া ইহারা নিঃশেষিত করে না, দুঃখের দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

পিপীলিকারা কথা কহিতে পারে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। পিপীলিকার কথা শুনিলে রাজা হওয়া যায়, বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহাতে ইহা অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু পিপীলিকাদিগের পরস্পরের নিকট পরস্পরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার যে কোন প্রকার সঙ্কেত আছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহাদের একটা চলিতে চলিতে পথে আর একটাকে দেখিলে কেমন থমকিয়া দাঁড়ায় এবং কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া পরস্পরে পৃথক্ হয়। একটা পিপড়া একস্থানে একটু মিষ্টদ্রব্য দেখিয়া গেলে কেমন পাল পাল পিঁপড়া কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় কোথা হইতে আসিয়া জমিয়া যায়।

পিপীলিকারা যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলে, তখন তাহাদিগের মধ্যে বড় বড় আকারের কয়েকটী দলপতি বা রক্ষকের মত দেখা যায়। তাহারা সম্মুখে ও পশ্চাতে থাকে এবং মধ্যে ২ এ পাশ ও পাশ দিয়া সকলের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। দেখিলে ঠিক যেন সুসজ্জিত সৈন্যদল চলিতেছে বোধ হয়। ইহারা এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ম পরতন্ত্র হইয়া চলে, যেন সকলি অগ্রে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়া ছিল বোধ হয়।

এ দেশের অনেক স্থলে গাছের পাতা ঠোঙ্গামত করিয়া মুড়িয়া পিপীলিকারা এক প্রকার বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং তাহাতে ডিম্ব সকল প্রসব করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করে। ইহারা যেরূপ পরিশ্রম ও বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা দেখিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর ক্ষুদ্র কীট পিপীলিকাকেও বিস্মৃত নহেন। তিনি তাহার প্রয়োজন সাধন জন্য এত অদ্ভুত কৌশল ও নৈপুণ্যে তাহাকে ভূষিত করিয়াছেন।

বাষ্প যন্ত্র।

মনুষ্য বুদ্ধিবলে বাষ্পের আবিষ্কার করিয়া কত অদ্ভুত ও অত্যাবশ্যক কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া লইতেছে। মনুষ্য যে সকল কার্য্য করিতে এককালে অক্ষম ছিল অথবা অনেক কষ্টে অনেক অর্থব্যয়ে অনেক সময় হরণ করিয়া যে কার্য্য সাধন করিত, বাষ্প দ্বারা তাহা সামান্য ব্যয়ে নিমেষে সম্পন্ন হইতেছে। বাষ্প জল তুলিতেছে, ভূমি চষিতেছে, পুস্তক ছাপিতেছে, সুতা কাটিতেছে, কাপড় বুনিতেছে, ময়দা পেষিতেছে, সুচ ও আলপিন তৈয়ার করিতেছে, ভূমি জল ও শূন্যের উপর দিয়া শকট ও যান সকল দ্রুতগতিতে লইয়া যাইতেছে। মনুষ্য ইহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে, সেই কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিতেছে। বাষ্পকে কার্য্যসাধক করিবার জন্য মনুষ্য যন্ত্র বা কল নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই বাষ্পীয় যন্ত্র মনুষ্যের অদ্ভুত সৃষ্টি. মনুষ্যের হস্ত-রচিত সকল কার্য্য অপেক্ষা ইহা অদ্ভুত। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ একটী জীবের সৃষ্টি করিতে পারে না সত্য, কিন্তু মনুষ্য নির্ম্মিত বাষ্পীয় যন্ত্র জীবের তুল্যানুতুল্য। বস্তুতঃ বাষ্পীয় যন্ত্রকে একটী জীব বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। উত্তাপ ইহার জীবন, বয়লার বা তাপাধার ইহার হৃৎপিণ্ড, যেমন হৃৎপিণ্ড হইতে জীবনপ্রদ রক্তস্রোত প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হইয়া শিরা ও ধমনী সকলকে পূর্ণ করে এবং সমুদায় শরীরকে জীবিত রাখে, তেমনি তাপাধার হইতে বলপ্রদ বাষ্প স্রোত প্রচুর পরিমাণে বহির্গত হইয়া যন্ত্রের নল সকলে সঞ্চারিত হয়। একবার রক্ত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া যেমন আবার হৃৎপিণ্ড হইতে সঞ্চালিত হয় এবং নাড়ী নিয়মিত গতিতে চলিতে থাকে, তাপাধার হইতে বাষ্প সেইরূপ ক্রমাগত নির্গত ও যন্ত্রের সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হইয়া যন্ত্রের কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। যন্ত্র আপনার পরিশ্রমে আপনার আহার ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। ভিন্ন২ বাষ্পযন্ত্র ভিন্ন২ প্রকারের ঘোটকের ন্যায়, যার যত বল সে তত কার্য্য করে। ঘোটক সুস্থ থাকিলে যেরূপ কার্য্য করিতে পারে, অসুস্থ হইলে সেরূপ পারে না, বাষ্পীয় যন্ত্র সেইরূপ সুনিয়মিত ও তাহার সকল অঙ্গ তৈলাক্ত থাকিলে ভাল কার্য্য করে, নতুবা করে না।

বাষ্পের অদ্ভুত ক্ষমতা কে প্রথমে আবিষ্কার করিল নিশ্চয় বলা যায় না।

পেপিন নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক ১৬৮০ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণ করিতে যান এবং পরে তত্রত্য (Royal Society) রাজকীয় চিত্রশালিকার এক জন অধ্যক্ষ হন। ইংরাজেরা বলেন তিনিই প্রথমে বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ইহার গুণ পরীক্ষা করেন। তিনি পর বৎসর 'ডাইজেষ্টার' নামে একটী যন্ত্র প্রস্তুত করেন, উত্তপ্ত বাষ্প বদ্ধ করিয়া রাখিলে কিরূপ স্থিতিস্থাপক ও ভয়ানক বলশালী হয়, তাহা প্রদর্শন করেন। বায়ুমণ্ডলের চাপ ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল, তিনি বারুদ পোড়াইয়া বা বাষ্প সঙ্কুচিত করিয়া (vacuum) শূন্যতা উৎপাদন পূর্ব্বক বায়ুর চাপদ্বারা একটী শক্তি উৎপন্ন করিবার প্রয়াস পান। তিনি পরে একটী জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে ডিবন সায়ার নিবাসী নিউকোমেন নামক একজন ইংরাজ কর্ম্মকার এবং কলি নামক একজন কুম্ভকার একত্র বাষ্পের গুণ অনেক অনুশীলন পূর্ব্বক ১৭০৫ সালে একটী বায়বীয় বা আগ্নেয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করে। এই সময় সেবরি নামক এক ব্যক্তি একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা কার্য্য করিত। এই তিন জনে একত্র হইয়া বাষ্পীয় যন্ত্রের পেটেণ্ট লইতে প্রবৃত্ত হইল। অগ্রে যন্ত্রের উপরে শীতল জল ঢালিয়া দিত, কোন দৈব ঘটনায় শীতল জলের পিচকারি দিবার অধিক উপকারিতা উপলব্ধ হইল। বাষ্প নির্গমের ঢাকুনি (valve) অগ্রে হাতে ধরিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু পটার নামক এক বালক অত্যন্ত ক্রীড়া প্রিয় ছিল, সে এই কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিরক্ত হইল এবং ঢাকুনী আপনি খুলিতে ও বন্ধ হইতে পারে, তাহার একটী কৌশল করিল। বেটন নামক এক সাহেব বালকের এই কৌশল অবলম্বন করিয়া ঢাকুনী আপনাআপনি খুলিবার ও বন্ধ হইবার প্রণালী আরও উৎকৃষ্ট করিলেন। এই উপায়ে ৫০ বৎসরের মধ্যে বাষ্প যন্ত্রের আশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া কয়লার খনির জল তুলিবার জন্য সকলে ইহা ব্যবহার করিতে লাগিল। এই সময়ে আমেরিকা নিবসী সুপ্রসিদ্ধ ওয়াট উদিত হইলেন। তিনি আপনার প্রতিভাবলে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে বাষ্পযন্ত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিলেন যে তিনিই বাষ্পযন্ত্রের প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। স্মিটন নামক আর এক শিল্পীও অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৭৬৯

সালে ওয়াটের প্রথম পেটেণ্ট গৃহীত হয়, ১৮০৩ সাল পর্য্যন্ত তাঁহারই নূতন ২ পেটেণ্ট হয়। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর এই বিষয়ের উন্নতি কল্পে আপনার জীবন সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে আধারে বাষ্প উৎপন্ন হইত, তাহাতেই তাহা শীতল করিয়া জমান হইত, কিন্তু তিনি দুই কার্য্যের জন্য দুইটী পৃথক্ আধার উদ্ভাবন করেন। তিনি বায়ুর চাপের সাহায্য না লইয়া বাষ্পের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করেন। বাষ্প যন্ত্র এখন সমুদায় সভ্যদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার অধিকতর প্রয়োজনের সহিত ইহার নূতন নূতন শ্রীবৃদ্ধিও সাধিত হইতেছে।

বাষ্প আর কিছুই নয়, জলীয় ধোঁয়া মাত্র। রন্ধনের সময় ভাতের হাঁড়ীর জল হইতে যে ধোঁয়া উঠে, তাহা যে পদার্থ, যে বাষ্পের বলে বৃহৎ ২ কল চলে তাহাও সেই পদার্থ। জল উত্তপ্ত হইলে তাহার পরমাণু সকল পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া বাষ্পের আকার ধারণ করে। /৮ পাথুরিয়া কয়লায় ১৭ সের জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে পারে। এক বুসেল বা ২০ সের কয়লায় প্রতি ঘণ্টায় এক এক বর্গ বুরুলে /৭॥ বাষ্প উৎপন্ন করে, তাহার বেগ সেকণ্ডে ১২৫০ ফিট বা ৯০০ হস্ত, এক এক মিনিটে ১ মণ জল বাষ্প করিলে একটী অশ্বের বল ধারণ করে। যে বাষ্প যন্ত্রের সিলিণ্ডার বাষ্পাধারের ব্যাস ৩১ ইঞ্চ এবং যাহাতে প্রতি মিনিটে ১০ বার ডবল ঘা পড়ে, তাহা দিনে ৫ টন বা ১৪০ মণ কয়লা পাইলে ৪০টী অশ্বের বলে ২৪ ঘণ্টা কার্য্য করিতে পারে।

ইংলণ্ডে এক্ষণে ১৫০০০ হাজারের অধিক বাষ্প যন্ত্র চলিতেছে এবং তাহাদিগের মধ্যে সহস্র অশ্বের বলধারী যন্ত্রও আছে। যদি গড়ে প্রত্যেক যন্ত্রের ২৫টী অশ্বের বল স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে বাষ্প যন্ত্র দ্বারা ৩,৭৫,০০০ অশ্বের কার্য্য চলিতেছে। একটী ঘোড়া ৫॥ জন মনুষ্যের সম বলী যদি ধরা যায়, তাহাহইলে ইংলণ্ডে বাষ্প যন্ত্র সকল ২০ লক্ষ মনুষ্যের পরিশ্রমের সাশ্রয় করিতেছে। প্রত্যেক অশ্বের বার্ষিক আহারের জন্য ২ একর* ভূমির উৎপন্ন চাই, যে কার্য্য বাষ্প যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা অশ্ব দ্বারা করিতে হইলে ৭,৫০,০০০ একর ভূমি অযত্র করিতে হইত।

* ১ একর এ দেশের ৩ বিঘা ভূমির সমান।

বাষ্প যন্ত্র সকল কেবল আগুণ ও কয়লা খাইয়া এক্ত ব্যয় বাঁচাইতেছে ও এক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে!

স্ত্রীশিক্ষা।

অপরাপর জন্তুর ন্যায় মনুষ্যজাতি দুইভাগে বিভক্ত,—স্ত্রী ও পুরুষ। ইহাদের পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, এবং কাহার কিরূপ অধিকার, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সুকঠিন; বস্তুতঃ স্ত্রীলোকদের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে হঠাৎ বোধ হইবে যেন ঈশ্বর তাহাদিগকে পুরুষের দাসীত্ব স্বীকার করিবার জন্যেই ভূমণ্ডলে পাঠাইয়াছেন। আপাততঃ তাহারা যেরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে সন্তানোৎপাদন, সন্তান প্রতিপালন ও পুরুষের শুশ্রূষা ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই; এই কয়েকটী মাত্রই তাহাদের জীবন ধারণের চরম উদ্দেশ্য। পাঠক এমন বুঝিবেন না যে স্ত্রীলোকেরা এক্ষণে যে সকল কার্য্যে সময় অতিবাহিত করে, আমাদের বিবেচনায় সে সকলে মনোনিবেশ করা অবিধেয়। আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি যে গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোকেরই কর্ম্ম; কিন্তু তাই বলিয়া তুমি তাহাকে পশুর সমান করিয়া রাখ কেন?

এক্ষণে স্ত্রীলোকদের যে সমস্ত অভাব রহিয়াছে (এবং সে সকল দুই একটীও নহে) তন্মধ্যে বিদ্যার অভাব সর্ব্বপ্রধান। বস্তুতঃ ইহাতেই অন্যান্য অভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। মনুষ্যের হৃদয়ে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে কি কি তাহার কর্ত্তব্য, এবং কোন্ কোন্ বিষয়েই বা তাহার অধিকার, তাহা সে কখনই সম্যক বুঝিতে পারে না। স্ত্রীলোকদের এই মহৎ অভাবটী দূরীকৃত করিতে পারিলে তাহাদের আর আর অভাব মোচনের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে এই আশা যে শীঘ্র ফলবতী হইবে এমন বিবেচনা হয় না। আমাদের দেশের কথা ত ধর্ত্তব্যই নহে, পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও স্ত্রীলোকদের অবস্থা বিশেষ তৃপ্তিকর বলা যায় না। আমাদের দেশে যেমন একজন গৃহিণী অপেক্ষা একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক শতাংশে বিজ্ঞতর, ইউরোপেও ঠিক্ সেইরূপ; সেখানেও স্ত্রীলোক শব্দের প্রধান অর্থ মূর্খ প্রাণী বিশেষ। একথা স্বীকার

করি বটে যে অস্মদ্দেশীয় মহিলাদের অপেক্ষা ইউরোপীয় মহিলারা সহস্রাংশে সুশিক্ষিতা, তথাপি তাঁহারা যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহা কোন ক্রমেই সন্তোষকর নহে। তাঁহাদের সময়ের অধিকাংশ নৃত্য গীত, চিত্রকরণ ও ইউরোপীয় আধুনিক প্রধান প্রধান ভাষায় কথোপকথন অভ্যাস ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সামান্য কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়। যদি স্ত্রীলোকের জন্ম প্রজাপতির জন্মের ন্যায় হইত, অর্থাৎ প্রজাপতি যেমন মনোহর পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া অলস চিত্তে এক উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ লঘু আমোদ কর কার্য্য ভিন্ন গুরুতর কার্য্য সমূহে স্ত্রীলোকের যদি কোন প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী উপযুক্ত বটে, কিন্তু মনুষ্যজীবন সেরূপ নহে। ইহলোকে আমাদের যাহা কিছু করণীয় আছে চিত্তোৎকর্ষ সাধন তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান; এবং যে শিক্ষাপ্রণালী এ উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযোগী, তাহাকে যত শীঘ্র অপসারিত করিতে পারা যায় ততই উত্তম। অনুক্ষণ এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে আমরা আলস্যে সময় ক্ষেপণ করিব বলিয়া কখনই ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে প্রেরিত হই নাই। আমরা যে অনশ্বর মনুষ্যাত্মা পাইয়াছি তাহাকে পরিপুষ্ট করিতে না পারিলে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে ইউরোপ খণ্ড উন্নতি পথে এত অগ্রসর হইলেও তথাকার স্ত্রীলোকেরা অদ্যাপি সে উন্নতির ফলভাগী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্গীয় মহিলারা যেন কখন এরূপ না ভাবেন যে বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহারা ইউরোপীয় মহিলাগণ অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নহেন। সামান্য জলাশয়ে ও বৃহৎ হ্রদে যত প্রভেদ, বঙ্গীয় ও ইউরোপীয় মহিলার মধ্যে তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। ইউরোপের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী নিতান্ত নিন্দাভাজন হইলেও তথাকার স্ত্রীলোকেরা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আমাদের দেশে শত বর্ষে সেরূপ হইতে পারিবে কি না নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তথাপি নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কোন বিখ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়াছিলেন 'অসম্ভব শব্দটীর কোন অর্থ নাই, ইহাকে অভিধানে স্থান না দেওয়াই কর্ত্তব্য।' অসম্ভব শব্দটী একেবারে অর্থশূন্য কি না আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে স্থির হইয়া উঠে না; কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা অনেক সময়ে যাহাকে অসম্ভব বলিয়া

থাকি বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব নহে; আমাদের অধ্যবসায়াভাব অসম্ভবতার কারণ। আমরা অনেক সময়ে যে সকল কার্য্য অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ফেলিয়া রাখি, যত্ন থাকিলে তাহাদের দশটার ভিতর পাঁচটা নিশ্চয়ই সম্ভব হইতে পারে। যে কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হওনা কেন, অধ্যবসায় না থাকিলে তাহা কোন কালেও সম্পন্ন হইবে না; এবং কায় মনোচিত্তে যদি সেই কার্য্য সাধনে সচেষ্ট হও, তাহাহইলে শত শত দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক থাকিলেও অবশেষে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে, ইউরোপীয় স্ত্রীরা এক্ষণে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই; ইহা শত শত বৎসরের অধ্যবসায়ের ফল। সেইরূপ, অধ্যবসায় অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে থাকিলে তাঁহারাই বা কেন কালক্রমে যথোচিত ফললাভ না করিবেন? একবার সকলে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় সংকল্পে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন বিদ্যা কিরূপ পদার্থ। একবার এই রসাস্বাদন হইলে আর ভুলিতে পারা যায় না। বারম্বার পানকর, যতদিন বাঁচিয়া থাক পানকর, তথাপি পরিতৃপ্তি নাই; দিন দিন সেই স্পৃহা বৃদ্ধি ব্যতীত কখনই হ্রাস হইবে না। কিন্তু স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস করিয়াই প্রয়োজন কি? গৃহিণী কি অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিতে পারিবেন? আমরা এক্ষণে এই বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

একটী কারণ হইতে দুই বা ততোধিক অধিক ফলোৎপত্তি হইলে তাহারা সকলেই কিছু সেই কারণের উদ্দেশ্য নহে। মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্র উভয়েরই কারণ, কিন্তু সূক্ষ্ম বৃষ্টি তাহার উদ্দেশ্য, বজ্র আনুসঙ্গিক উদ্দেশ্য মাত্র। সেইরূপ বিদ্যাভ্যাস হইতে অর্থোপার্জ্জন হয় বলিয়া অর্থোপার্জ্জন কখনই তাহার উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্যের অন্তরে যে এক অনশ্বর পদার্থ আছে, তাহাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা। অন্ধকার রজনীতে যেমন আমরা বস্তু সকল দেখিতে পাইয়াও তাহাদের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম, সেইরূপ মূর্খতা-রূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলে আমাদের মানসিক চক্ষু স্বরূপতঃ কিছুই জানিতে পারে না; জগতের কার্য্য কারণ ভাব অবগত না থাকায় যাহা কিছু দেখি সকলই অসম্বদ্ধ বলিয়া বোধহয়। ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখি অসংখ্য জ্যোতিক মণ্ডলী নীল পথে অনুক্ষণ আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াই

তেছে; পয়োদরাজী ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন বেশ ধরিয়া ভাসিতেছে, ও পরে শিলা ও বারিধারা রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে; আবার অধোদেশে এতদপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে; কিন্তু বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সে সকল উজ্জ্বলীকৃত না হইলে সকলই অন্ধকারময়, চির কাল সকলই অসম্বদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। এক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন বিদ্যানুশীলনের সহিত অর্থোপার্জ্জনের কিরূপ সম্বন্ধ। তবে আর কখন এমন ভ্রম হইবে না যে যাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না, তাহাদের লেখা পড়া শিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাতেই সব শেষ হইল না। লেখা পড়া শিখিলে আর কি কি মহৎ উপকার হইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ,—এমন কেহ আশা করিতে পারেন না যে চিরকাল সুখসচ্ছন্দে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইবে। জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যু যেমন অনিবার্য্য, শোক দুঃখও সেই রূপ। কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তোমার সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইয়া দুঃখকে স্থান দিবে। এই জগতের গতিক। কিন্তু ঈশ্বর যে কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে এইরূপ স্থির করিয়া রাখুন না কেন, তিনি বিনোদনোপায়ও স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি লিখিতে পড়িতে জানেন, এক একখানি পুস্তক তাঁহার কাছে এক একটী অমৃতাগার সদৃশ। যখন হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয় তখন এই অমৃতাগারের অমৃত যেমন সেই দুঃখ নিবারণ পক্ষে মহৌষধ তেমন আর কিছুই নহে। পুনশ্চ, সুখাবস্থাতেও মধ্যে মধ্যে এমন সময় উপস্থিত হয় যে সকলই বিস্বাদ ও বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অবস্থা অতি স্বল্পকালস্থায়ী বটে, কিন্তু ঘোর দুঃখের সময়েও এমন ভয়ানক হৃদয় যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইতে হয় না। লেখা পড়া শিখিবার এই এক মহাফল যে এরূপ অবস্থায় হৃদয় অন্য সকল বিষয়ে বিরক্ত হইলেও পুস্তক পাঠে মহা আনন্দ লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ,—স্বদেশের উপকার সাধন মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যোদ্ধা খড়্গ-হস্তে সমরতরঙ্গে ভাসিয়া, ও সুলেখক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশের যেরূপ উপকার করেন, স্ত্রীলোকে সন্তান প্রতিপালন করিয়া স্বদেশের তদপেক্ষা অল্প শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না। বস্তুতঃ, কিঞ্চিৎ ভাবিয়া

দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—যে স্ত্রীলোকের দ্বারা যেমন দেশের উন্নতি হইতে পারে তেমন আর কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উন্নতি সাধন যে পরিমাণে তাঁহাদের ক্ষমতাধীন, অবনতি সাধন তদপেক্ষা অধিক বলিতে হইবে। ভবিষ্যতে কাহাদের দ্বারা দেশের উপকার হইবে?—উত্তর, এক্ষণে যাহারা শিশু। অতএব এক্ষণে যিনি যেরূপে সন্তান প্রতিপালন করিবেন ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা দেশে সেই রূপ ফলাফল লাভ হইবে। প্রতিপালন শব্দের অর্থ শিক্ষা প্রদান; শুদ্ধ ভরণপোষণ নহে। ভরণপোষণ প্রতিপালনের সামান্য অংশ মাত্র। শৈশবাবস্থায় বালকের শিক্ষা জননীর নিকট। এই শিক্ষা কখন কি রূপে সম্পন্ন হইতেছে তাহা কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু ইহার ফলাফল গুরুতর। বস্তুতঃ এই ফলাফল ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের অন্য কোন প্রমাণ নাই। জননীর প্রতি কথায়, প্রতি ইঙ্গিতে বালক যত শিক্ষা করিবে, অন্য কেহ তাহাকে এক মাস ধরিয়া শিখাইলেও সে কখনই তত শিখিতে পারিবে না। অতএব একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বালকের শিক্ষা সম্পূর্ণ জননীর অধীন। যদি জননীর হৃদয় কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হয়, বালকের মন প্রশস্ত হইবে, যদি জননী কুসংস্কারপূর্ণা হন, বালকও সেইরূপ থাকিবে। সে ভবিষ্যতে যতই চেষ্টা করুক না কেন বাল্যকালে জননীর নিকট যাহা যাহা শিখিয়াছে, সে সকল সে কখনই একেবারে ছাড়িতে পারিবে না। এক্ষণে পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা কত দূর। কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিতা হইলে শুধু তাঁহারাই মূর্খ রহিলেন এমত নহে; তাঁহাদের দোষে সমগ্র দেশটী কুসংস্কার পূর্ণ হইয়া রহিল।

স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে অনেক কথা বলা হইয়াছে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই এক্ষণে দেখা যাউক বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা কি রূপ। বলিতে কি আমরা যত দূর জ্ঞাত আছি তাহাতে এমন ভরসা হয় না যে বঙ্গীয় স্ত্রীরা শীঘ্র বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্ত পাঠকবর্গ আমাদের এই কথায় যেন এরূপ না ভাবেন যে শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীলোকদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের কোন অভাব আছে। আমাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস তাঁহাদের এরূপ কোন

অভাব নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গুটীকতক বিশেষ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। এই সকল প্রতিবন্ধকের কয়েকটী তাঁহাদের আপনাদের দোষ হইতে এবং কয়েকটী অন্যান্য কারণ হইতে উৎপন্ন। তাঁহাদের আপনাদের দোষ হইতে যে গুলি উৎপন্ন হইতেছে, তজ্জন্য আমরা নিন্দা করিতে পারি না। বিদ্যানুশীলন প্রথমতঃ অতি কষ্টকর। ইহা হইতে যে সকল সুখোৎপত্তি হয় প্রথমে তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা বিদ্যানুশীলনে প্রথমে যদি নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ন্যায়তঃ দোষী করিতে পারি না। তিক্তরস শরীরের গ্লানিনাশক বটে, কিন্তু যিনি এবিষয় অবগত নহেন, তিনি এমন বিস্বাদ দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক কেন ব্যবহার করিতে চাহিবেন? স্ত্রীলোকদের আপনাদের ঔদাসীন্য ব্যতিরেকে অন্যান্য কারণ হইতে যে সকল বিঘ্ন জন্মিতেছে, আমরা নিম্নে তন্নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথমতঃ,—স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে পুরুষদের সম্পূর্ণ যত্নাভাব। পিতা পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার জন্যে যথাসাধ্য ব্যয় করিতে কাতর নহেন, কিন্তু কন্যার শিক্ষার জন্য এক পয়সা ব্যয় করিতে হইলে মহা ভার বোধ হয়। এই মহা নগরীতে যত লোকে পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইতে ব্যগ্র, তাঁহাদের মধ্যে ষোড়শাংশের একাংশও কন্যার শিক্ষার জন্য একবার ভাবেন কি না বলিতে পারি না। আবার যাঁহারা কন্যার শিক্ষার জন্যে মাসে মাসে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তাঁহারাও সম্পূর্ণ উদাসীন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবিয়া কিছু কিছু ব্যয় করিতে কাতর নহেন বটে, কিন্তু কন্যা কি শিখিতেছে কি না শিখিতেছে ইহা একবার তাঁহারা দেখিবেন না। বামাবোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য বহির্ভূত হইলেও আমরা এই স্থলে উদাহরণ স্বরূপ একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে প্রায়ই মেমেরা বাটীতে আসিয়া পড়াইয়া যান। আমরা যত দূর জ্ঞাত আছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে এই সকল মেম তাঁহাদের ছাত্রীদিগকে বাইবেল শিখাইতে ত্রুটি করেন না। অবশ্য যাঁহারা আপনাদের অথবা কর্ত্তৃপক্ষদের ইচ্ছানুসারে খৃষ্টধর্ম্ম শিখেন, তাঁহাদিগকে আমরা কোন কথা বলিতেছি না; কিন্তু যাঁহাদিগকে শুদ্ধ মেমদের অভিরুচি অনুসারে বাইবেল পড়িতে

হয় তাঁহারা কি জন্য আবশ্যক বিষয় সকল ছাড়িয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম শিখিবেন? বাইবেল পড়িলেই খৃষ্টান হইয়া যাইবে এ ভাবিয়া আমরা ভীত নহি; বঙ্গীয় মহিলারা সুশিক্ষিতা না হইলেও তাঁহাদের সদ্বুদ্ধির উপরে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু কর্ত্তাদের কি চমৎকার সাবধানতা!

দ্বিতীয়তঃ—পুস্তকাভাব। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা হন, কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীলোকের শিক্ষোপযোগী পুস্তক অতি বিরল। যে কয়েক খানি ভাল গ্রন্থ আছে, সমুদায়ই কল্পনাত্মক। আমরা কল্পনাত্মক গ্রন্থের নিন্দা করি না বটে, কিন্তু তথাপি একথাও বলিব যে শুদ্ধ এরূপ পুস্তক পাঠে বুদ্ধি শক্তি কখনই সুচারুরূপে মার্জ্জিত হইতে পারে না। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েক খানি সুন্দর মাসিক পত্রিকায় এই অভাব অনেকাংশে দূরীকৃত হইতেছে। যত্নের সহিত এই সকল পত্রিকা পাঠ করিলে অনেক উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষকের অভাব ও সামান্য বিঘ্ন নহে। কিন্তু সে বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তৃতীয় বিঘ্ন বিবাহ। অল্প বয়সে স্বামি গৃহ করিতে হইলে পুত্র প্রসব করিয়া সংসার জালায় বিব্রত হইলে লেখা পড়া শিখিবার সময় অতি অল্পই থাকে। কিন্তু হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সুমহৎ রোগের প্রতিকার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। আমাদের যে সকল পাঠিকা অদ্যাপি অবিবাহিতা আছেন, তাঁহারা যাহাই বলুন আমরা একথা বলিব যে বাল্য বিবাহ অতি নিন্দাস্পদ প্রথা।

এখন বঙ্গীয় মহিলাগণ ভাবিয়া দেখুন তাঁহাদের অবস্থা কি শোচনীয়! পুরুষেরা তাঁহাদের জন্য অণুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিবেন না। স্ত্রী শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে যে সময় অতিবাহিত হইবে, সে সময়টী হাস্য কৌতুকে অতিবাহিত করিতে পারিলে তাঁহাদের কি সুখের বিষয়! তবে একমাত্র উপায় আছে। অন্যান্য বিষয়ের মত স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা সম্বন্ধে এক্ষণে পরাধীন হইলেও চেষ্টা করিলে কিছু না কিছু ফল লাভ অবশ্য করিতে পারেন। 'আপনার কর্ম্ম আপনাকে সাজে' এই আশ্বাস বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহারা সকলে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হউন। ঈশ্বর স্ত্রীলোককে মনুষ্যাত্মা দিয়াছেন, তবে স্ত্রীলোক কেন না পুরুষের সমান হইবেন? চেষ্টা কর,—ঈশ্বর ফলদাতা।

চেষ্টা আমার ক্ষমতাধীন; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তাহাতে আমার দোষ নহে। আর কার্য্য সিদ্ধি কেনই না হইবে? স্ত্রীলোকেরা যাবজ্জীবন মূর্খ হইয়া থাকিবে এমন কিছু ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যের গৌরবে তাঁহার গৌরব। কিন্তু যত দিন স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান সুশিক্ষিতা না হইবেন, ততদিন ঈশ্বরও মনুষ্য নাম এই দুয়েরই গৌরব অসম্পূর্ণ হইয়া রহিল।

বিশ্বতত্ত্ব।

হে অসীম! এ অসীম সাম্রাজ্য তোমার!
কেবল কৈবল্য-ময়, শিবের ভাণ্ডার!—
অ-মূল্য জগতে যাহা, অতুল্য, অক্ষয়,
অজস্র আসার ধারে বরষণ হয়!
পরস্পরে নানা সুখ যোগায় সকলে,
বলিহারি যাই! তব নিপুণ কৌশলে!
যাহা দেখি তা'তে সুখ তা'তেই কল্যাণ,
ইন্দ্রিয় ভরিয়া করি অবিশ্রান্ত পান!
নবোদ্যমে উদ্যমিত, নব রাগে গোলে,
দিবা নিশি ভাসিতেছি আনন্দ হিল্লোলে!
চিরদিন মাতৃকোলে সদা অবস্থিতি,
নব নব সুখ ভোগে রত নিতি নিতি!
কিছুরি অভাব নাই—মনে মাত্র হ'লে,
অমনি তাহাই প্রাপ্ত হই করতলে;
যাহা কিছু সাধু ইচ্ছা, সুসম্পন্ন কর,
এমনি আমার তুমি প্রাণের ঈশ্বর!
এ হেন অসীম বিশ্ব সাম্রাজ্যে যেমন
রাজ রাজেশ্বর হ'য়ে, করিছ শাসন,

তেমনি এ ক্ষুদ্রতম আমার হৃদয়—
রাজ্যে রাজা হ'য়ে, রাজ্য কর দয়াময়!
এমনি তোমার দয়া, এমনি হে কাজ!
প্রতি ক্ষণে নিজ চক্ষে, দেখ মহারাজ!
বড় ছোট সকলের তারতম্য নাই,
মরি! কি উদার দয়া বলিহারি যাই!
সকলের সনে তব প্রেম অবিচ্ছেদ,
কিছুতে কাহারো নাহি রাখিয়াছ খেদ!
পিতার অধিক হ'য়ে করিছ পালন,
মাতার অধিক স্নেহে করিছ লালন,
প্রভু হ'য়ে করিতেছ শাসন বিধান,
বন্ধু হ'য়ে আপনারে করিয়াছ দান,
পরিজন হ'য়ে কর যতন সতত,
গুরুর অধিক হ'য়ে শিক্ষা দাও কত!
কে আছে এমন রাজা দরিদ্র বৎসল,
আপনারে দিয়া সাধে প্রজার মঙ্গল!
অসীম জগদ রাজ্য, অচিন্ত্য, অব্যয়,
সকলেই প্রজাপূর্ণ, শূন্য কিছু নয়,
কিবা জল,—নদ,হ্রদ, নদী সরোবর,
দীর্ঘিকা, তড়াগ, সিন্ধু, অসীম সাগর,
কিবা স্থল,—সুবিস্তীর্ণ বন, উপবন,
নিবিড় কানন, মহা বিজন গহন,
মরুভূমি, কৃষিক্ষেত্র, প্রশস্ত প্রান্তর,
শিলাময় তুঙ্গ শৃঙ্গ-পর্ব্বত কন্দর,
সজন নগর, পল্লী, ধরা পৃষ্ঠ পর,
গভীর ভূগর্ভ-স্থিত স্তরের অন্তর—
ভয়ান আগ্নেয় গিরি, উষ্ণ প্রস্রবণ,
উষ্ণতম দ্রবীভূত ধাতু নিকেতন!

কিবা বায়ু, কিবা বহ্নি, কিম্বা শূন্য দেশ,
সকলেই প্রাণী-পূর্ণ, বর্ণিতে অশেষ ;—
সকলে তোমার প্রজা, তোমার কিঙ্কর,
সকলের রাজা তুমি, রাজ-রাজেশ্বর !
কেবল কি ধরা সীমাবদ্ধ তব রাজ্য ?
কত শ্রেষ্ঠ লোক আছে, কে করে নির্ধার্য্য ?
এই যে বিস্তীর্ণ শূন্য আকাশ অর্ণবে,
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিগণ, ভ্রমিছে নীরবে,
বিজলিছে, রত্নরাজী উজলিছে হেন,
সিন্ধু মাঝে লঙ্গরিয়া পোত শ্রেণী যেন !
রাশি রাশি, রাশিগ্রহ গণ অগণন,
নীল লতা কুঞ্জে যথা কুসুম কাঞ্চন।
আকাশ-কুসুম রাজি, আকাশে বিকাসে,
শ্বেত শতদল যেন নীলজলে ভাসে !
আঁধারে অম্বরে শোভা জগমনোলোভা,
নীলাম্বরে যেন স্বর্ণ চুমকীর শোভা !
আ মরি ! কি হেরি, শোভা মাধুরী লহরী,
অনুপম, কিসে তার উপমান করি !
স্বভাব স্বভাবে পূর্ণ, অতুলন ছবি,
স্ব-ভাবে স্বরূপ তার, তোলে কোন্ কবি ?
কৃষ্ণপক্ষ রজনীতে নিশীথ সময়,
নীরব সমস্ত ভব, শব্দ মাত্র নয়,
তিমির বরণ সব ঘোর দরশন,
স্থানে স্থানে বিভীষিকা বিলোকে নয়ন,
সু-স্বনে সমীর স্বনে শব্দ সর সর,
মর্ম্মরে পাদপ, পত্র কাঁপে থর থর,
এহেন তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে যথন,
নয়ন তুলিয়া করি, অম্বর-ঈক্ষণ,

অমৃত অমৃত জ্যোতি আহা কি উজলে।
বিমল সু-নীল বর্ণ আকাশ মণ্ডলে।
অনুপম শোভা রাশি। উপমা কোথায়?
মরি মরি! কি মাধুরী, বর্ণনা না যায়।
সেই ভাল জানে, ভাল দেখেছে যে জন,
কে বুঝাবে তারে যে না করেছে দর্শন?

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, গুজরাট নর্ম্মাল কলেজের শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য সরাবজী নামক এক ভদ্রলোকের দুইটী অবিবাহিতা কন্যা রাজকীয় ব্যয়ে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ কি করিতেছেন?

২। লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগকে এম ডি পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৩। ভাগলপুর জেলায় একটী স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ৫০ জন কনষ্টেবল প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। জমীর অধিকারীকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইতেছেন, কিন্তু ভূস্বামী অর্দ্ধেক অংশ প্রার্থনা করিতেছেন।

৪। অমৃতসর মিসনের বিবী ক্লার্ক সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে এণ্টারটেনমেণ্ট নামক সভায় একটী কাম্বিতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

৫। রুসিয়ার সহিত তুরুস্কের যুদ্ধ বাধিয়াছে। আসিয়া ও ইউরোপ উভয় খণ্ডেই ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে।

৬। সুপ্রসিদ্ধ মুন্সী প্যারিলালের অধীনে উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যায় বিবাহ ব্যয় হ্রাস করণার্থ লক্ষ্ণৌয়ে একটী মধ্য কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। দেওয়ান অচরু মল, মুন্সী নেওল কিশোর, মুন্সী কালীপ্রসাদ, বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ এবং রায় নারায়ণ দাস এই কমিটীর প্রধান সভ্য। বঙ্গদেশে এরূপ একটী সভা হওয়া অতি আবশ্যক।

পাঠিকাগণ সভ্য দেশের কেমন বিবাহ প্রথা দেখুন—ইংলণ্ডে রিচার্ড হমটন নামে এক জন ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধা এন্ বিরাটকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হন। বিবাহের দিন স্ত্রীলোকটী আহারের একটী জিনিস প্রস্তুত করিয়া হমটনকে খাইতে দেন। পাক ভাল না হওয়ায় হমটন্ তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন এবং পীড়ার ছলনা করিয়া বিবাহ করেন না। এন্ রিচার্ড নালিস করিয়া হমটনের বিরুদ্ধে ১০০ টাকা ক্ষতি পূরণের ডিক্রী পাইয়াছেন।

ভারতবর্ষে বন্যজন্তু ও সর্প দংশনে প্রতি বৎসর ২১ হাজার মনুষ্য হত হইয়া থাকে।

বামাগণের রচনা।

চিন্তিত যুবক।

১

দিনমণি অস্তাচলে করিছে গমন।
কমলিনী ম্লান প্রায় হয়েছে এখন,
মৃদু ২ দোলাইয়া লতা পাতা গণ
ধীরে ২ বহিতেছে মলয় পবন।

২

নিরমল শশধর উদিত আকাশে,
চারিদিকে অগণন তারকা বিকাশে,
চকোর চকোরী দেখি পূর্ণ সুধাকর
সুধাপানে অতিশয় প্রমোদ অন্তর।

৩

ফুটিয়াছে মনোহর কুসুম সুন্দর
মধুপানে হরষিত ভ্রমর নিকর,
সরোবরে বিকশিত নলিনী সুন্দরী
জীবলোক পুলকিত শশধর হেরি।

৪

নবীন দূর্ব্বার দলে শিশির নিচয়
চন্দ্রমার কিরণেতে অতি শোভাময়।

রয়েছে খদ্যোত কুল তরুর উপরে,
হরিত বরণে আহা কিবা শোভাধরে !

৫

হেন কালে যুবা এক ভাসি চিন্তা নীরে,
ভ্রমিতেং গেল তটিনীর তীরে।
কুলুং স্বরে নদী সাগরে মগন,
উম্মাদিনী কল্লোলিনী করিছে গমন।

৬

প্রবাহিনী বক্ষে ধরি শশীর ছায়ায়,
তরঙ্গের ভরে কভু মৃদুল দোলায়।
দুধারে রয়েছে তার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন,
নানা জাতি শস্যপূর্ণ অতি সুশোভন।

৭

দেখি প্রকৃতির শোভা নয়ন রঞ্জন,
হইল যুবক এবে পুলকিত মন,
চিন্তা দূরে গেল, যুবা প্রফুল্ল অন্তরে,
পরমেশে ধন্যবাদ দিল ভক্তি ভরে।

৮

ওহে বিভো বিশ্বপতি দয়ার সাগর,
অখিল স্বজন কর্ত্তা সর্ব্ব গুনাকর !
চিন্তায় আমার মন ছিল জ্বালাতন,
তোমার কৃপায় হলো শান্তিতে মগন।

পিঞ্জরে পাখী।

হে পাখি ! দুঃখিত মনে পিঞ্জরে বসিয়া।
কি ভাবিছ মনে মনে নয়ন মুদিয়া॥
লোহার শিকলে তব আবদ্ধ চরণ।
যাইবারে নাহি পার যথায় মনন॥

দলসহ ছিলে বনে স্বাধীন যখন।
যেখানে হইতে ইচ্ছা করিতে গমন॥
পর্ব্বত গুহায় কিবা নিবিড় কাননে।
নিরমল সুখে তুমি যেতে নানা স্থানে॥
গাইতে মধুর গীত হয়ে স্বাধীন।
সুখের সময় এবে হইয়াছে লীন॥
পূর্ব্বমত হতে বুঝি হয়েছে বাসনা।
খেতে সুমধুর ফল তৃষিত রসনা॥
কোথায় রয়েছ তুমি কোথা সঙ্গীগণ।
সে সুখের দিন আর নাহিক এখন॥
যথায় আছিলে সুখে সহচর সনে।
আবার যাইতে তথা সাধ হয় মনে?
মধুর আহার আর লৌহময় দাঁড়।
ভাল নাহি লাগে পাখী অন্তরে তোমার॥
বিশাল রসাল মূলে বাঁধিয়া কুলায়।
কত সুখে দিবানিশি থাকিতে তাহায়॥
অতীব কঠিন কিন্তু লোহার শিকল।
কাটিতে তোমার চঞ্চু বড়ই দুর্ব্বল॥
কোন সুখ নাহি পাখী তোমার এখন।
চরণে রয়েছে সদা কঠিন বন্ধন॥
নির্ব্বোধ মনুষ্য সদা নিজ সুখে রত।
অন্য জনে দুঃখ দিতে না হয় বিরত॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে না দেখে নয়নে।
পাপ পিঞ্জরেত বদ্ধ হয় দিনে দিনে॥

শ্রীসুকুমারী ঘোষ
কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়।

———

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৬৬ সংখ্যা } জ্যৈষ্ঠ—বঙ্গাব্দ ১২৮৪ { ১৩ শ ভাগ।

বিশ্ব বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা।

বঙ্গদেশীয় রমণীগণ ১২৮৩ সালের ৫ ই চৈত্র দিবসকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখুন, এই দিবস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহাদিগেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার অধিকার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই সুব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন, কিন্তু 'সময় হয় নাই' বলিয়া তাঁহারা ইহাতে অগ্রসর হন নাই। গত বৎসর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু নাম্নী একটী বঙ্গীয় বালিকা উপযাচিকা হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বসাধারণকে চমৎকৃত করেন। চন্দ্রমুখীর দ্বারা যেমন বঙ্গললনা-কুলের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, তেমনি তাঁহা হইতেই স্ত্রীজাতির বিদ্যোন্নতির একটী প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ একটী রমণীর যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া আর কি বলিয়া স্ত্রীজাতিকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিবারিত রাখিবেন? সুতরাং তাঁহারা আপনা হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষার্থিনী হইবার অধিকার দান করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকেরা পরীক্ষার্থিনী হইবার অধিকার পাইলেও কি বিষয়ে এবং কি প্রকারে তাঁহাদিগের পরীক্ষা হইবে, তাহার মীমাংসার জন্য কিছু দিন হইল

সিণ্ডিকেটের (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভার) একটী অধিবেশন হয়। তাহাতে এই তিনটী প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে :—

(১) প্রবেশিকা পরীক্ষা পুরুষদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের সমান থাকিবে।

(২) স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা স্বতন্ত্র স্থানে ও স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহিত হইবে।

(৩) স্ত্রীলোকদিগের উচ্চতর পরীক্ষার ব্যবস্থা একটী বিশেষ কমিটীদ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু কার্য্য প্রণালী কতদূর উপযোগী হইয়াছে, একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার বিষয় সকল সমান করা উচিত কি না এ বিষয়ে শিক্ষিত সমাজে দুই মত আছে। এক পক্ষ বলেন, স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক প্রকৃতি জগদীশ্বর একরূপই করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে সমানরূপ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের মতে স্ত্রী পুরুষের যে কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়, সে কেবল অবস্থা, অভ্যাস এবং দেশাচার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করিলে স্ত্রী পুরুষ সমান হইয়া যাইবে। আমেরিকা খণ্ডে এই মতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব এবং সেখানকার স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিতা হইয়া পুরুষদিগের সকল পদ ও মর্য্যাদা ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই মতের অনুবর্ত্তীরা এ দেশেও পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীগণকে সর্ব্ববিষয়ে সমান দেখিতে চান। শিক্ষিত আর এক দলের মতে জগদীশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী দুই বিভিন্ন প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রকৃতি অনুসারে তাঁহাদিগের বিভিন্ন কর্ত্তব্য ও অধিকারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরুষ চেষ্টা করিয়া কতক স্ত্রীলোকের গুণ উপার্জন করিতে পারে এবং স্ত্রীলোক চেষ্টা করিয়াও কতকটা পুরুষের মতও হইতে পারে, কিন্তু এরূপ হওয়া স্বাভাবিক নহে এবং ইহাতে সমাজের অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগের মতে যাহাতে সাহসী, দৃঢ়চিত্ত ও বৈষয়িক কার্য্যদক্ষ হওয়া যায়, পুরুষগণ এরূপ শিক্ষা লাভ করুন এবং যাহাতে ধীর, কোমলপ্রকৃতি এবং গৃহকার্য্যে পটু হওয়া যায়, স্ত্রীলোকগণ এরূপ শিক্ষা লাভ করুন। পুরুষদিগের জ্ঞান শিক্ষার

উদ্দেশ্য এবং স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য এইরূপ স্বতন্ত্র থাকিবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সামঞ্জস্য ও সম্মিলনে মনুষ্য সমাজ পূর্ণাঙ্গ এবং যথার্থ সুখের স্থান হইবে। আমরা এই বিভিন্ন মতের গুণাগুণের এখন বিচার করিতে চাই না, কারণ এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা এখন এত হীন, যে পুরুষদিগের সহিত তাহাদিগের সর্ব্বাংশে সমান করিবার কল্পনা করাও উন্মত্ততা। বিশ্ববিদ্যালয়ও ইহাঁদিগের পরস্পরের কতক অংশে স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা উভয়ের ঠিক্ সমান কেন করিলেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। আমাদিগের মতে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই বিজ্ঞের কার্য্য, তাহা হইলে সমাজের যথার্থ উপকার হইবে, নতুবা ব্যবস্থা হয় ব্যর্থ হইবে, নয় সমাজের উপকার না করিয়া অপকার করিবে। আমাদিগের স্ত্রীলোক গণের সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগের শিক্ষা ও পরীক্ষার নিয়ম পুরুষদিগের হইতে কতকটা স্বতন্ত্র করা অন্ততঃ আপাততঃ নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়।

প্রথমতঃ পুরুষদিগের ন্যায় এদেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার উপায় নাই। উপযুক্ত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, পুস্তক এবং শিক্ষক এই তিনটী উপায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশ বালিকাগণের ক্রীড়ার স্থান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বালিকা বিদ্যালয় সকলে যেরূপ শিক্ষা হয় তাহা এত নিম্ন, যে শিক্ষা নামেরই উপযুক্ত নয়। দেশের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য ২।৪টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও ছাত্রী সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই কয়েকটী বিদ্যালয়ে আবার খৃষ্টান বা ব্রাহ্মরমণীগণই অধ্যয়ন করেন, সাধারণ হিন্দুসমাজের স্ত্রীলোক গণের তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু বালিকাদিগের জন্য এত টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় বেথুন বিদ্যালয় চলিতেছে, দুঃখের বিষয় তাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পাঠ শিক্ষারও কিছু উপায় নাই।

পুস্তক সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। বাঙ্গালাভাষায় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার উপযোগী পুস্তকের এখনও প্রায় সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করা সামান্য কষ্ট ও কালসাপেক্ষ নহে

এরূপ স্থলে তাঁহাদিগের উপর অধিক পুস্তকের ভার চাপাইলে নিষ্ঠুরতা হয়।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষকের অভাব আরো গুরুতর। ইহাদিগের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে যে লাভ হয়, তাহা সামান্য। অধিকাংশ শিক্ষা আপনার অথবা পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর ন্যায় আত্মীয়ের সাহায্যের উপরে নির্ভর করে।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার যেরূপ অবস্থা, তাহা বিবেচনা করিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যদি তাহাদিগের একটী নিম্নতর পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম করিতেন, তাহাহইলে তাহাদিগের উপযুক্ত হইত। উচ্চশিক্ষার পরীক্ষা, করিলেও যে বিষয়গুলি তাঁহারা অধিকাংশ নিজের যত্নে শিক্ষা করিতে পারেন পরীক্ষায় তাহারই ব্যবস্থা করিলে সঙ্গত হইত।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য যদিই উপযুক্ত বিদ্যালয়, পুস্তক এবং শিক্ষক থাকে, পুরুষদিগের ন্যায় সকল শিক্ষা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় কে বলিবে? আমাদিগের স্ত্রীলোকগণের অধিকাংশই অন্তঃপুরিকা রমণী। তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় শিক্ষা তাহাকেই বলি যাহা দ্বারা তাঁহাদিগের গৃহের কল্যাণবর্দ্ধন ও শোভা সম্পাদন হইতে পারে অথবা তাঁহাদিগের নিজের মানসিক উন্নতি হয় বা ঘরে বসিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইতে পারে। ইহা বিবেচনা করিলে কঠোর গণিত প্রভৃতি বিদ্যা তাঁহাদিগের গৌণ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যে সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া প্রয়োজন সাধন না হয়, তাহার শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

তৃতীয়তঃ পুরুষগণ যাহা শিক্ষা করেন না, এরূপ কতকগুলি বিষয় স্ত্রীগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সন্তান পালন, গৃহকর্ম্ম, শিল্প ও নীতিশিক্ষা স্ত্রীগণের যদি না হয়, তাঁহাদিগের শিক্ষা নিতান্ত অপূর্ণ ও বিফল হইবে। ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌স কোন বিদ্যাবতী রমণীর বিদ্যাবত্তা জানিবার জন্য প্রথম এই প্রশ্ন করেন, তিনি রন্ধন করিতে জানেন কি না? এরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত বোধ হয়না। উৎকৃষ্ট শিক্ষা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন গ্রীক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন "তোমার সন্তানকে সেই পথে লইয়া চল, যে পথে তাহাকে যাইতে হইবে এবং বৃদ্ধকালেও যাহা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না।"

স্ত্রীলোককে চিরজীবন একপথে যাইতে হইবে, এখন প্রথম বয়সে সেপথে

চলিতে না দিয়া অন্য পথে চলিতে শিক্ষা দিলে সে শিক্ষার কি ফল লাভ হইবে? ইহাদ্বারা দুই একটী অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু না স্ত্রীসাধারণের না সমাজের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

আমাদিগের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ যদি স্ত্রীপুরুষের সর্ব্ববিষয়ে সমানত্ব দেখিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার বাসনা করিয়া থাকেন, যে সকল রমণী পুরুষগণের সহিত সমান পরীক্ষা দিতে প্রার্থিনী হন, তাঁহাদিগের পথ রোধ না করিলেই হয়। তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা করুন্। স্ত্রীলোক সাধারণের জন্য পরীক্ষাপ্রণালী কিছু পরিবর্ত্তিত করিলে ক্ষতি কি? প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরাজী সাহিত্য স্ত্রীলোকদিগের জন্য আরো কিছু সহজ হউক, বাঙ্গালা যেমন তেমনি থাকুক ইতিহাস পরীক্ষা বাঙ্গালায় হউক, গণিতের ভাগ কমান হউক। শিল্প, ধাত্রীশিক্ষা এবং গৃহকর্ম্মের কিছু কিছু বিষয় পরীক্ষা মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে হয়। ইহাহইলে পরীক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উৎসাহকর ও যথার্থ উপকারী হইতে পারে। আমরা আশা করি কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এখন পারেন, প্রবেশিকায় এইরূপ বিষয় প্রবর্ত্তিত করুন, ফাষ্টআর্ট ও বিএ পরীক্ষার এ বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন। এখন লোকে বলিতেছে তাঁহাদের এ কিরূপ বিবেচনা? স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার সময় হয় নাই বলিয়া এতদিন এককালে উদাসীন ছিলেন; আর এখন সদয় হইয়া যদি স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশের পথ দিলেন, তবে একবারে তাহাদিগের উপর পূর্ণ বোঝা চাপাইয়া দিলেন, তাহাদিগের অবস্থা ও প্রকৃতি এবং দেশের অবস্থা ও গতি একবার বিবেচনা করিলেন না। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ আশা দিয়া নিরাশার কষ্টে নিক্ষেপ করা কি তাঁহাদিগের অভিপ্রায়?

যাহাহউক পাঠিকাগণকে আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতে বলি। তাঁহারা কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং আপনাদিগের যত্নে ইহাতে কৃতকার্য্য হউন। কেহ যেন বলিতে না পারে, স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ অধিকার দিলাম, কিন্তু তাহারা উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহা লাভ করিতে পারিল না। অনেক অসুবিধা, অনেক কষ্ট এবং অনেক নিরাশা তাঁহাদিগের পথে আছে, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন জ্ঞানতৃষ্ণা যদি প্রবল থাকে,

সকল প্রতিকূল অবস্থা পরাস্ত হইবে এবং তাঁহাদিগের যত্ন সফল হইবেই হইবে। এরূপ গৌরবের পথ সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহার কঠিনতা দেখিয়া তাঁহারা কি পরাঙ্মুখ হইবেন? তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এ সময় দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন,!! তাঁহারা স্ত্রীসমাজের চির কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাভাজন হইবেন।

প্রাচীন সাম্রাজ্য চতুষ্টয়।(১)

প্রাচীন কালের ইতিহাসে আসিরিয়া, পারস্য, মাসিডন এবং রোম এই চারিটী মহারাজ্য সাম্রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের মতে নিমরড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দিগ্বিজয়ী। তিনি আসিরিয়া সাম্রাজ্য এবং তাহার রাজধানী বাবিলন সংস্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র নাইনস, নিনিভা নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার সাম্রাজ্য ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল। নাইনসের পর তাঁহার মহিষী সেমিরেমিস তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হন। তিনি পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রবল প্রতাপে বহুদিন রাজত্ব করেন, এবং মিশর, ইথিয়োপিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। তিনি আপন পুত্র নিনিয়াসকে রাজ্য দিয়া পরলোকে যান। নিনিয়াসের পর ১৩০০ বৎসরের মধ্যে ৩০ জন রাজা হন। নিমরড বংশের শেষ রাজা সার্ডানাপ্লস অত্যন্ত ভোগবিলাসী ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। তিনি শত্রুভয়ে সপরিবারে গৃহমধ্যে অগ্নিদিয়া পুড়িয়া মরেন। অতঃপর আসিরিয়া সাম্রাজ্য কাল্‌ডিয়া ও পারস্য এই দুই রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই দুই রাজ্য ২০০ বৎসর পরস্পর স্বতন্ত্র ছিল, তৎপরে মহাত্মা সাইরস দুই রাজ্যকে একত্র করিয়া পারস্য মহারাজ্য স্থাপন করেন। এই মহারাজ্য ২০০ বৎসর স্থায়ী হইয়া ভারত-

---

(১) ভারতবর্ষ ও চীন প্রাচীন সম্রাজ্য হইলেও ইউরোপীয় ইতিহাসে সচরাচর স্থান প্রাপ্ত হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে এই দুই সাম্রাজ্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না। ইহাদিগের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রকাশ্য।

বর্ষ হইতে গ্রীসদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। সাইরসের পুত্র কাম্বাইসিস আফ্রিকা জয় করেন। তাঁহার জামাতা ডেরায়স ইউরোপ অধিকার করিতে গিয়া গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ইহা পারস্য যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। পারস্য সৈন্যদল অপরিমেয় হইয়াও থার্ম্মাপলি, মারেথন ও সালামিস এই কয়েক স্থানে গ্রীকদিগের অল্প সৈন্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। কিছুকাল পরে মাসিডনের রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করেন। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আপনার জয় বিস্তার করেন। তিনি সমুদায় পৃথিবী জয় করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সৈন্যগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে অস্বীকৃত হওয়াতে পঞ্জাব হইতে স্বদেশাভিমুখে ফিরিয়া যান, পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি গণ তাঁহার সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লন এবং পরস্পরের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য ক্ষয় করেন।

ইউরোপের মধ্যে গ্রীসদেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সভ্য। গ্রীকদিগের বিদ্যা, বীরত্ব ও স্বদেশহিতৈষিতা ভুবন বিখ্যাত। ইহাদিগের মধ্যে মিলটাইডিস, পেরিক্লিস, ইপামিনণ্ডাস, জেনোফন, সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টটল প্রভৃতি মহাত্মা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টের জন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে রমুলস রোমনগর সংস্থাপন করেন। রোমানদিগের ন্যায় অল্প বীর জাতি পৃথিবীতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় ইটালী অধিকার করে, পরে গ্রিস ও আফ্রিকা হস্তগত করিয়া লয়। তৎপরে ভারতবর্ষ ও চিন ভিন্ন আসিয়ার সমুদায় সভ্যদেশ এবং স্কটলণ্ড পর্য্যন্ত ইউরোপের সমস্ত দেশ জয় করে। রোমে প্রথমে রাজ্যতন্ত্র, পরে সাধারণ তন্ত্র এবং অবশেষে সাম্রাজ্য তন্ত্র এই তিন প্রকার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের ৭ম বা শেষ রাজা টার্কুইনের পুত্র সেক্সটস লুক্রিসিয়া নাম্নী এক সতী নারীর প্রতি অত্যাচার করাতে রাজ্যতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। আগষ্টস সিজার হইতে সাম্রাজ্যতন্ত্রের আরম্ভ হয়। ইহাঁর সময়ে রোমের রাজত্ব ও গৌরব উচ্চতম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। রোমের বিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে ক্রুটসদ্বয়, সিপিয়োদ্বয়, কেটোদ্বয়, জুলিয়াস সিজর, পম্পে, সিসিরো, কামিলস, মেরিয়স, সলা, টাইটস বিশেষ বিখ্যাত। রোমানদিগের মধ্যে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় বলিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় দুইজাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেক কাল

ঘোরতর গৃহবিবাদ চলিয়া শেষে দুইজাতি এক হইয়া যায়। রোমের সাধারণ তন্ত্রের কালই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিতা ও উন্নতির কাল। রোমেতিহাসের প্রধান ঘটনা এই ঃ—গল নামক অসভ্য জাতি দ্বারা রোম আক্রমণ ও ধ্বংস। ৩০ বৎসরের পর সামনাইট জাতির পরাজয়। কার্থেজিনীয় সেনাপতি হানিবল কর্ত্তৃক ইটালী আক্রমণ। মাসিডন ও গ্রিস জয়। তিনটী পিউনিক যুদ্ধ ও কার্থেজ ধ্বংস। সম্রাট কন্‌ষ্টান্টাইন দ্বারা রোম সাম্রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভাগ। গথ, ভাণ্ডাল ও তুরুষ্ক প্রভৃতি অসভ্য জাতি দ্বারা রোমের ধ্বংস।

মাকড়সা।

মাকড়সার আশ্চর্য্য গঠন ও কার্য্য-প্রণালীর বিষয় আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে শিখিয়াছি, কিন্তু ইহার বিষয়ে আরো কতকগুলি নূতন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পাঠিকাগণের গোচরার্থ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

লিপজিক নগরের অধ্যাপক ওয়েবার বলেন, একটী ক্ষুদ্র মাকড়সা দুইটী বৃক্ষের মধ্যে তাহার জাল নির্ম্মাণ করিতেছিল। যে ৩ টী প্রধান বিন্দুতে জালের সূত্র সংলগ্ন করিল, তাহাতে একটী সমবাহু ত্রিভুজ হইল। উপরের দুই বিন্দু দুই বৃক্ষের গুঁড়িতে রহিল, কিন্তু তৃতীয় বিন্দু স্থাপনের স্থান না পাইয়া মাকড়সা সূত্রের মুড় হইতে একটী ছোট ঢিল ঝুলাইয়া দিল। ঢিল মাকড়সার শরীর অপেক্ষা ভারী হওয়াতে জাল প্রসারিত করিয়া রাখিল।

মাটীর মধ্যে মাকড়সারা বাসা বাঁধিয়া থাকে, ইহার একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পারিস বিজ্ঞান সভায় পঠিত হয়। সেটী কর্সিকা দ্বীপের মাকড়সা। সে ছই বুরুল গভীর কূপের আকার একটী বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহার ভিতরে জালের বুনানি এবং ইহার উপরে একটী ঢাকুনি, যেন হাঁসকল দিয়া আঁটা, মাকড়সা বাসার ভিতর প্রবেশ করিলে ঢাকুনিটী পড়িয়া বাক্সর দ্বার বন্দ হইত। এই ঢাকুনি মাটী ও মাকড়সার জালে প্রস্তুত, ইহাতে ৫০ থাক বুনানি ছিল।

জল মাকড়সা।

জল মাকড়সারা শিকারের জন্য জাল খাঁটায় না; কিন্তু ইহাদিগের শিকারের উপায় যার পর নাই আশ্চর্য্য। এই জগৎ যে এক জন জ্ঞানময় সৃষ্টিকর্ত্তার রচিত, তাহার আর কোন প্রমাণ না থাকিলেও জল-মাকড়সার আশ্চর্য্য সংস্কার ও কার্য্য-প্রণালী দ্বারা প্রতিপন্ন হইত। এই জন্তু নদী তীরে শিকার ধরিয়া জলের ভিতর গিয়া তাহাকে আহার করে। এই জন্য ইহাকে স্থল ও জল উভয় স্থানে বাস করিতে হয়। স্থলের বায়ু গ্রহণ করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না ফেলিলে ইহার প্রানরক্ষা হয় না, অথচ জলের ভিতর গিয়া ইহাকে অধিক সময় থাকিতে হয়, এই অভাব মোচনের জন্য জগদীশ্বর ইহাকে এক প্রকার জল নিমজ্জন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। মনুষ্যগণ অনেক বুদ্ধি কৌশলে জল নিমজ্জন যন্ত্র অতি অল্প দিন হইল প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা এক প্রকার ঘণ্টার ন্যায়, মনুষ্য জলে ডুবিয়াও ইহার মধ্যে বসিয়া সচ্ছন্দে সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইতে পারে ও সে স্থান হইতে জলমগ্ন দ্রব্য সকল উদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মনুষ্যের অনেক পূর্ব্বে স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা মাকড়সা এই যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। জল মাকড়সা প্রথমে কতকগুলি আলগা সূতার খেই বুনে, পরে তাহা কোন জলীয় উদ্ভিদের পাতায় লাগাইয়া দেয়। পরে তাহাতে এক প্রকার আটার মত রস শরীর হইতে নির্গত করিয়া মাখাইয়া দেয়। এই রস দ্রবীভূত কাঁচের ন্যায়, তাহা ইচ্ছা করিলে বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিতে পারে। তৎপরে ইহার আপনার শরীরের উপর তরল কাঁচের একটী আবরন প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে বায়ু বুদ্‌বুদ পূরিয়া দেয়। প্রাণিবিদ্যাবিদ পণ্ডিতদিগের মতে ইহা জলের ধারে গিয়া গুহ্য দ্বার দিয়া এই বায়ু বায়ুমণ্ডল হইতে আকর্ষণ করিয়া লয়, কিন্তু কিরূপে এই বায়ু বায়ুমণ্ডল হইতে গৃহীত হইয়া মাকড়সার আবরণের মধ্যে যায়, তাহা পরিষ্কৃত রূপে নিরূপিত হয় নাই। যাহাহউক তৎপরে মাকড়সা সেই আবরণে আবৃত হইয়া এক ডেলা পারদের মত শোভা পাইয়া থাকে। তখন সে জলের মধ্যদিয়া যেখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই খানে তীরের মত ছুটিয়া যায় এবং বুদ্‌বুদটী আবরনের ভিতর হইতে আশ্চর্য্য কৌশলে

নিম্নস্থ জালে সরাইয়া দেয়। তৎপরে জলের উপরিভাগ হইতে নিম্নভাগে বার বার নামিয়া উঠিয়া প্রত্যেক বার আবরণটী নূতন বুদ্‌বুদে পূর্ণ করেন বায়ু বাহির হইয়া ক্রমে আবরণটী লঘু বায়ুতে পূর্ণ হয়। জলের মধ্যে এই বায়ুপূর্ণ শুষ্ক সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া মাকড়সা তাহাতে বাস করে। এই গৃহ আকারে পায়রার ডিম্বের অর্দ্ধেক। এই গৃহের ভিতর হইতে মাকড়সা শিকার করে—কখন ভূমিতে কখন জলের মধ্যে আহারান্বেষণ করে এবং আহার পাইলে এই জল নিম্নস্থ গৃহে লইয়া সুখে ভোজন করে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় জাতীয় মাকড়সারই এবিষয়ে এক রূপ সংস্কার আছে। বসন্তকালের সমাগম হইতে হইতেই পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সার গৃহে যায় এবং তথায় আরো কিছু বায়ু আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে বিস্তৃত করিয়া উভয়ে এক গৃহে সচ্ছন্দে বাস করে। বৈশাখ মাসে ডিম্ব প্রসূত হয় এবং গৃহের এক কোণে রেসমী গুঁটির মধ্যে রক্ষিত হয়। স্ত্রী মাকড়সা সর্ব্বদা এই ডিম্বের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

শিকারী মাকড়সা।

এক জাতীয় মাকড়সা ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকারের উপর ঝম্প দিয়া পড়ে। আরো আশ্চর্য্য এই, তাহারা পার্শ্বদিকে লাফাইয়া পড়িতে পারে। এই জাতীয় একটী মাকড়সা দুই ফিট দূরে একটী মৌমাছির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছিল। শিকারী মাকড়সারা ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে মাছি বা অন্য লক্ষ্য জন্তুর অগোচরে তাহার নিকটস্থ হয়। মাছি চলিলে মাকড়সাও চলে, পশ্চাৎ দিকে, সম্মুখে, পার্শ্বে সকল দিকে তাহার অনুরূপ চলে। ঠিক এক সময়ে সমান দূরে থাকিয়া এমন চলে যেন বোধ হয় তাহারা উভয়ে কোন অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া চালিত হইতেছে। মাছি যদি উড়িয়া মাকড়সার পশ্চাৎ দিকে গিয়া বসে, শিকারকে দেখিবার জন্য মাকড়সার মস্তক এত শীঘ্র ঘুরে, যে মানুষের চক্ষু তাহা শীঘ্র ধরিতে পারে না এবং মাকড়সাকে নিস্পন্দ মনে করে। এই সকল কৌশল খেলিয়া যখন মাছিকে কাছে পায়, তখন ভয়ানক ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং বিদ্যুতের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করে। এই জন্তুদিগের সদ্‌গুণের মধ্যে এক সন্তান বাৎসল্য আছে।

বার্ব্বারি মাকড়সা।

এই মাকড়সা মনুষ্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় মোটা। জিপ্সী নামক বেদিয়ারা যেমন সন্তানকে থলিয়ায় পূরিয়া লইয়া যায়, ইহাও শাবকদিগকে সেইরূপে বহন করে। শাবকেরা যত দিন অক্ষম থাকে, এই থলিয়ার মধ্যে বাস করে, সময় সময় ক্রীড়া বা আমোদের জন্য বাহিরে বেড়াইতে যায়। ইহারা এমন নৃশংস প্রকৃতি, যে যে মাতা তাহাদিগকে এত কষ্টে ও যত্নে বহিয়া বহিয়া লইয়া প্রতিপালন করে, ইহারা বড় হইয়া তাহাকে ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করে। তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলে মারিয়া ফেলে এবং তাহার শরীরে উদর পুরণ করে। আমেরিকা খণ্ডে এক জাতীয় মাড়কসা আছে, তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ লোমাবৃত। ইহারা আকারে এত বড়, যে ছোট ছোট পক্ষীদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করে এবং ভক্ষণ করে।

ইউরোপে এইরূপ বৃহদাকার মাকড়সার দুইটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। পারিস নগরের ইউষ্টেস্‌ নামক গিরজায় অত্রত্য ভৃত্য এক প্রদীপ তৈল দিয়া যাইত, কিন্তু তাহা অল্পক্ষণ পরে ক্ষয় হইয়া প্রদীপ নিবিয়া যাইত। প্রত্যহ এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা হইত। ভৃত্য ইহার কারণ নিরূপণ করিবার জন্য একদিন স্বয়ং রাত্রি জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল। অবশেষে দেখিল একটী বৃহদাকার মাকড়সা উপর হইতে শিকল বাহিয়া আসিয়া প্রদীপের তৈল ভক্ষণ করিতেছে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মিলানের এক গিরজায় একটী বৃহৎজাতীয় মাকড়সা দেখাযায়, ইহাও তৈল ভক্ষণ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিত। ইহাকে মারিয়া ফেলিলে মৃতদেহ ওজন ৴২ সের হইল। পরে ইহা ভিয়েনার রাজকীয় চিত্রশালিকায় রক্ষিত হয়।

বৃক্ষপত্র ও আলোক।

যাঁহারা উদ্ভিদ বিদ্যা কিছু পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন বৃক্ষপত্রের উপর যখন সূর্য্যের আলোক পড়ে, তখন তাহাহইতে অম্লজন বা জীবনপ্রদ বায়ু নির্গত হয়, জন্তুগণ নিঃশ্বাস দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই পত্র যখন ছায়া বা অন্ধকারে থাকে, তখন কারবলিক আসিড বাষ্প বা প্রাণ

নাশক বায়ু বহির্গত হয়, জন্তুগণ তাহার আঘ্রাণে মরিয়া যাইতে পারে। পত্র সকল গাছে থাকিলেই যে আলোক ও অন্ধকারে এইরূপ বিপরীত কার্য্য করে, তাহা নয়। টাটকা পাতা গাছ হইতে পাড়িয়া সূর্য্যের আলোকে রাখিলে তাহা হইতেও অম্লজন বহির্গত হয় এবং অন্ধকারে রাখিলে অধিক পরিমাণে বিষাক্ত বায়ু নির্গত হয়। দুই সের জল ধরে এমন একটা বোতলে আধ ছটাক পরিমাণ তূঁতপাতা রাখিয়া ঘণ্টাকাল সূর্য্যোত্তাপে ধর। তৎপরে বোতলটা উপুড় করিয়া তাহার মুখে একটা পলিতা জ্বালিয়া ধর, আলোক উজ্জ্বলতর, শুভ্রতর এবং বৃহত্তর দেখিবে। ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হয় যে পত্র হইতে জীবনপ্রদ বায়ু বহির্গত হইয়া বোতলে অধিক সঞ্চিত হইয়াছে। কারণ যে বায়ুতে জীবন রক্ষা হয়, তাহাতেই আলোক জলে এবং তাহারই নাম অম্লজন। এই বিষয়টী আরো পরিষ্কার রূপে বুঝিবার জন্য একটী কেবল বায়ুপূর্ণ বোতলের ছিপি খুলিয়া পলিতা ধরিয়া দেখ, তাহা সেরূপ জ্বলিবে না। প্রথম পরীক্ষার পর যে বোতলে তূঁত পাতা ছিল, তাহাতে জল দেখা যাইবে। এই জল কোথা হইতে আসিল? জ্বলন্ত পলিতার উত্তাপে সরস পাতার রস বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া বোতলের গায় লাগিয়াছিল, তাহা শীতল হইয়া বোতলের তলায় জমিয়াছে। বোতলে যে পরিমাণে জল দেখা যাইবে, পাতা সেই পরিমাণে শুষ্ক হইবে।

আর একটী এইরূপ বোতলে আধ ছটাক ওজনের তূঁতপাতা পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া দেও। পরে ঐ বোতল অন্ধকার স্থানে অথবা কাপড় জড়াইয়া বাক্সের মধ্যে রাখ, যাহাতে তাহার সহিত আলোক স্পর্শ না হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে বোতলের ছিপি খুলিয়া তাহার মধ্যে একটী জ্বলন্ত পলিতা বা জীবন্ত পক্ষী প্রবিষ্ট কর, পলিতা নিবিয়া এবং পক্ষী মরিয়া যাইবে, ঠিক্ যেন তাহাদিগকে জলমগ্ন করা হইল। ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হয়, অন্ধকারে বৃক্ষপত্র বিষাক্ত বায়ু উদ্গীরণ করিয়া থাকে।

ভারত অঙ্গনা।

জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া মনুষ্য সমাজ দিন দিন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে। এ জ্ঞানালোকের গতির শেষ নাই। ঐ সুদূর গগনে

নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া ঐ যে ক্ষুদ্র নক্ষত্র অতি মৃদুভাবে জলিতেছে, উহার আলোক অতি অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, ক্ষীণ, তথাপি উহাই এক প্রকাণ্ড সূর্য্য!—হয়তো আমাদিগের সূর্য্যাপেক্ষা শত শত গুণ বড়!—পৃথিবী হইতে উহার আলোক যতই কেন ক্ষীণ বোধ হউক না—উহা হয়তো এক নাক্ষত্র জগতের কেন্দ্র—সেই জগতের গ্রহ উপগ্রহনিবাসী প্রাণী সমূহের তাপ, আলোক ও জীবনের একমাত্র কারন। পরন্তু কেবল তাহাই নহে। আলোক প্রাকৃতিক বলমাত্র—বলের বিনাশ নাই; অতএব সেই অনুজ্জ্বল ক্ষীণ আলোক, সেই প্রাকৃতিক মহাবল, যে কোন না কোন প্রকারে কেবল ঐ নাক্ষত্র জগতে নহে, কেবল ঐ কয়টী মাত্র গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতুতে নহে,—কিন্তু সমস্ত বিশ্বসংসারে এক সৌর জগৎ হইতে অপর সৌর জগতে, এক নাক্ষত্র জগৎ হইতে অপর নাক্ষত্র জগতে,কার্য্য করিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। জ্ঞানালোকও আলোক বিশেষ। ইহা প্রাকৃতিক আলোক নহে, মানসিক আলোক, মানসিক বল। অতএব এই জ্ঞানালোক, মানসিক মহাশক্তি—প্রাকৃতিক বলের ন্যায় অবিনশ্বর, অনন্তকাল স্থায়ী। এক সময়ে ভারতবর্ষ যে, এই জ্ঞানালোকের প্রভাবে উজ্জ্বলিত হইয়াছিল, এই মহাশক্তি প্রভাবে উন্নতশিরঃ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণায় জীবন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু সে আলোক বহুকাল নিবিয়াছিল, সে সূর্য্য বহুকাল ডুবিয়াছিল, পুনরায় এদিকে ঐ ভারতসমুদ্র পারে, দূরে মহা আটলাণ্টিক পারে, পুণ্যখণ্ড ইউরোপের ঊর্দ্ধগগনে এক নূতন তপন উঠিয়াছে; উহার রশ্মিজাল ভারত সমুদ্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল আলোকে শোভিত করিতেছে। ইহাই সেই পুরাতন শক্তি নূতন রূপে আবির্ভূত। ভারতের নর নারী সকলেই ব্যগ্র নয়নে ঐ আলোকাভিমুখে চাহিয়া আছে: সকলেই আলোক দর্শনে আশ্বাসিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতেছে। ভারতবদনে আজি নূতন কান্তির, নূতন স্ফূর্ত্তির উদয়। এমন সময়ে ভারত সন্তানের কিরূপ অবস্থা, তাহা আলোচনা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরাও আজি তাহাই করিব—কিন্তু ভারত সন্ততির এক ভাগ মাত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, অর্থাৎ আমরা সাধারণতঃ ভারত নারীর এবং বিশেষতঃ বঙ্গনারীর বিষয় আলোচনা করিব। আমাদিগের যেন স্মরণ থাকে, যে, যে বিষয় মনে করিলে, প্রতি চিন্তার তরঙ্গে, প্রতি ভাবের

হিল্লোলে, আমাদিগের হৃদয় সরোবরে, করুণাময়ী জননীর দেবী মুর্ত্তিখানি, প্রেমময়ী পত্নীর সখী মুর্ত্তিখানি, স্নেহময়ী ভগিনীর শান্ত মুর্ত্তিখানি, ভক্তিময়ী কন্যার কোমল মুর্ত্তিখানি একে একে যেন ভাসিয়া ২ আসিতে থাকে—যে বিষয় মনে করিলে, জীবনের ভোগ, মরণের সুখ, সংসারের আলোক, পরলোকের জ্যোতি, সকল গুলিই চিত্রপটে যেন অঙ্কিত হইয়া যায়, যে বিষয় মনে করিলে সংসারের সুখ দুঃখ, স্নেহ ভক্তি, প্রেম প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে, জগদীশ্বরের করুণা পূর্ণ কোমল স্নেহোজ্জ্বল মুর্ত্তি মনে পড়ে, আজি আমরা সেই উন্নত পবিত্র গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বঙ্গ রমণীকুলের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা দেখা কর্ত্তব্য। এতৎ সম্বন্ধে পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ গুলিই বিশেষ সহায়। কিন্তু সে সকল গ্রন্থে বঙ্গ নারীর চরিত্র চিত্রিত কি সমস্ত ভারতবর্ষের স্ত্রী চরিত্র চিত্রিত, ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। আমরা স্বীকার করি যে তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্ত খণ্ডের অর্থাৎ হিমালয় হইতে বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদায়ের রমণী চরিত্র বর্ণিত আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী প্রাচীন হিন্দুদিগের বংশধর এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সামাজিক এবং পারিবারিক বিষয়ের উপদেশও তদন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি ভোজন, শয়ন, গমন প্রভৃতি প্রাত্যহিক কার্য্য সম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে হইবে—এরূপ বাঁধাবাঁধির অবস্থায় যে বঙ্গমহিলার চরিত্র সাধারণ ভারত মহিলার ছাঁচে গঠিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সাধারণ ভারত মহিলার চরিত্র লইয়াই প্রস্তাব আরম্ভ করিব।

ভারত সমাজ পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলে পর্য্যালোচকের মনশ্চক্ষু প্রথমে স্বতঃই এক দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ ভারত মহিলার স্বাধীনতার অভাবের প্রতি। দুই শতাব্দ পূর্ব্বে যখন শ্বেতকায় ইংরেজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই, তখন এরূপ হইত কি না সন্দেহস্থল। কিন্তু এক্ষণে যখন নেত্রের পলক পড়িতে না পড়িতে এক দিগে বৃটিষ ললনার উন্নত স্বাধীন প্রফুল্ল মূর্ত্তি, অপর দিগে স্বাধীন প্রকৃতির অভাবে অস্ফুট মনোবৃত্তি হিন্দু সিমন্তিনীর বিমর্ষ আনন দেখিতে পাই, তখন এতদুভয়ের তারতম্য আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে পারি।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম পর্য্যালোচকের মনশ্চক্ষু স্বতঃই অপ্রতিহত ভাবে স্ত্রী স্বাধীনতার অভাবের প্রতি ধাবিত হয়। অস্মদন্তঃপুরচারিণীদিগের কখন স্বাধীনতা * ছিল কি না, এবং এক্ষণেও আছে কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অনেকে বলিয়া থাকেন যে হিন্দুরমণীগণের গৃহ প্রাচীরের বাহিরে গমন মুসলমান সম্রাটদিগের সময় হইতে বন্ধ হইয়াছে। তাঁহাদিগের বিশ্বাস বা অনুমান এই যে মুসলমান সম্রাটগণ অতিশয় দুরন্ত ছিল, তাহাদিগের দৌরাত্ম্য ও উপদ্রবের ভয়ে হিন্দু সমাজ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত, এমন কি হিন্দুগণ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া জানিতেন, এরূপ অবস্থায় হিন্দুগণ তাহাদিগের সংসার বনের সুকোমল পুষ্পগুলি যত্নে লুক্কায়িত ভাবে পালন ব্যতিরেকে আর কি করিতে পারেন? অগত্যা তাঁহারা স্ব স্ব মাতা, কন্যা, ভগিনী, জায়ার মঙ্গল উদ্দেশে, সমস্ত নারী কুলের মর্য্যাদা রক্ষার্থ হিন্দু মহিলাদিগকে গৃহ প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা উপরি কথিত রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাঁহাদিগের কথা কতকটা সত্য এবং যুক্তিসঙ্গত ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে যে হিন্দুমহিলাগণ স্বেচ্ছাক্রমে গৃহ হইতে বহির্গমন করিতে পারিতেন এ কথা আমরা স্বীকার করি না। যদিও মহাভারতের এক স্থলে লিখিত আছে "অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্"—পূর্ব্বে স্ত্রীগণ আবৃত অর্থাৎ গৃহ প্রাচীরাবৃত ছিল না—তথাপি অপর অনেক প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হিন্দু রাজাদিগের সময় হইতে, মহাভারত রামায়ণ প্রণয়নের সময় হইতে, অতি প্রাচীন

* স্বাধীনতা সম্বন্ধে কতকগুলি লোকের একটি বিষম ভ্রম লক্ষিত হয়। তাঁহারা স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া যথেচ্ছাচারের পক্ষ সমর্থন করিয়া ফেলেন, স্বাধীনতা বীরান্তঃকরণের ভূষণ, যথেচ্ছাচারিতা কাপুরুষের হৃদয় ক্লেদ, স্বাধীনতা উন্নত মনের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, যথেচ্ছাচারিতা নীচ মনকে গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করে। স্বাধীনতা স্বর্গসম্ভব, ঈশ্বর প্রেরিত, যথেচ্ছাচারিতা নরক সম্ভব, ঈশ্বর ঘৃণিত। আমরা যে বিষয়ের কথা পরে বলিতেছি, তাহা অস্মদ্ রমণী কুলের স্বাধীনতার অভাবের বিষয়, যথেচ্ছাচারিতার অভাবের বিষয় নহে। যথেচ্ছাচারিতাকে আমরা ঘৃণা করি। স্বাধীনতাকে আমরা মহা মূল্য বলিয়া আদর করিয়া থাকি।

কাল হইতেই আর্য্য অঙ্গনাগণ অন্তঃপুর ছাড়িয়া স্বেচ্ছাক্রমে বহির্গমন সম্বন্ধে স্বাধীনতা চ্যুত হইয়াছিলেন। মহাভারতের নলোপাখ্যানে বর্ণিত আছে যখন নলরাজা, দময়ন্তীর পিত্রালয়ে তাঁহার সুরক্ষিত ভবনে দৈব শক্তিবলে উপনীত হন, তখন দময়ন্তী অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া নলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"কথমাগমনং চেহ কথং চাসি ন লক্ষিতঃ।
সুরক্ষিতং হি মে বেশ্ম রাজা চৈবোগ্রশাসনঃ॥"

"কিরূপে আপনি এখানে আসিলেন? কেহ কি আপনাকে দেখিতে পায় নাই? আমার ভবন উত্তমরূপে রক্ষিত, রাজার শাসনও কঠোর।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে লিখিত আছে বিদর্ভরাজতনয়া রুক্মিণী শিশুপালকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছু হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিকামনায় পত্র লিখিবার সময় তাঁহার অন্তঃপুরে অবস্থিতির এইরূপ উল্লেখ করিতেছেনঃ—

অন্তঃপুরান্তচরীমনিহত্য বন্ধূং
স্ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ং।"

আমার বন্ধুবান্ধবকে বিনাশ না করিয়া কিরূপে আপনি অন্তঃপুরচারিণী আমাকে লইয়া যাইবেন, তাহার উপায় আমি বলিয়া দিতেছি।"

এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেও রমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু এতৎ সত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে রামের বনগমন কালে সীতা তাঁহার অনুগামিনী হয়েন, পাণ্ডবদিগের সহিত দ্রৌপদী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, স্বয়ম্বর সভায় কন্যা স্বয়ং আসিয়া আকাঙ্ক্ষিত বরের গলদেশে মাল্য অর্পণ করিতেন, ইত্যাদি। ইহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে রমণীর অন্তঃপুর বাস সাধারণ নিয়ম, অন্তঃপুর পরিত্যাগ বিশেষ নিয়ম। আজিও যদিও প্রায় সেই রূপ চলিতেছে, তথাপি সমাজের প্রয়োজনানুরোধে তাহা সতাই অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ভরসা করি স্বরায় এ প্রথা অন্তর্হিত হইবে। এরূপ নিয়ম অতিশয় স্বার্থপর ও কদর্য্য তাহার সন্দেহ নাই। হইতে পারে কোন সময়ে (যেমন মুসলমান রাজত্ব কালে) সমাজের প্রয়োজন অনুসারে এইরূপ নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সমাজের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ নিয়মের প্রয়োজন ক্রমে দূরীভূত হইতেছে।

যাঁহারা মনে করেন রমণীগণকে গৃহে আবদ্ধ রাখিলে তাহাদিগের মঙ্গল হয় ও সতীত্ব ধর্ম্ম সুরক্ষিত থাকে, তাঁহাদিগকে মহুর সহিত আমরাও বন্ধুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করি যে,

" আত্মানমাত্মনা যাস্ত রক্ষেয়ুস্তা সুরক্ষিতাঃ।"

"যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।" বাস্তবিক স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক গৃহে রুদ্ধ রাখিলেই রক্ষিত হইল এমত নহে; তাহাতে বরং স্ত্রীপুরুষের সহৃদয়তা না জন্মিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাসের লাঘব হইবারই সম্ভাবনা।

এক্ষণে দেখা যাউক আর্য্য কন্যাদিগের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে কিরূপ স্বাধীনতা ছিল। ইহাতেও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা সকল বিষয়েই পুরুষের একান্ত বশীভূতা হইয়া থাকিবে।

তিষ্ঠেৎ পিতুর্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সংপ্রাপ্ত যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতি বন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎকচিৎ॥

স্ত্রী বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পতি বন্ধুদিগের বশে থাকিবেক, কখন স্বতন্ত্রা হইবেক না। এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ।

আমরা আজ্ঞানুবর্ত্তিতার বিরোধী নহি। উপযুক্ত ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহাতেই আমরা বলি শাস্ত্রকারের আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ হইলে অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু পুরুষই সংসারের এক মাত্র রাজা, রমণী প্রজা মাত্র, একথা আমরা স্বীকার করি না। মনুষ্য সমাজের শৈশবাবস্থায়, শারীরিক বলই একমাত্র বল ছিল, অতএব সে সময়ে যে পুরুষ তাহার কোমলাঙ্গী সংসারার্দ্ধ ভাগিনীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিত, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু মনুষ্য সমাজের আর সে অবস্থা নাই। এখন মানসিক বলই বল বলিয়া পরিচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আর পুরুষ একা রাজত্ব করিতে পারিবেন না; এখন স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া যুগ্ম রাজত্ব করিতে হইবে। বস্তুতঃ বিদ্যানুশীলন এবং জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের সহিত নরনারীর সাম্য স্থাপিত হইবে। আমাদিগের দেশে যে এতকাল এই সাম্য স্থাপিত হয় নাই তাহার কারণ স্ত্রীপুরুষের অসমান শিক্ষা। পুরুষ বিদ্যাভ্যাস করিবে, শাস্ত্র পাঠ করিবে, বেদ অধ্যয়ন করিবে, রমণী সে সকল

কিছুই করিতে পারিবে না। সকল দেশেই পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, ভারতবর্ষ একা এজন্য দোষী নহে। বেদ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ কঠোর আদেশ আছে, যথা—"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা"—স্ত্রী, শূদ্র, এবং পতিত ব্রাহ্মণ, ইহারা বেদ পাঠ শুনিতে পর্য্যন্ত পাইবে না। তথা, মনুঃ—"নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়ামন্ত্রৈঃ"—স্ত্রীলোক দিগের বেদ মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু মনুষ্য সমাজ সর্ব্বদা এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই অতি প্রাচীন কালে গার্গী আত্রেয়ী অরুন্ধতী প্রভৃতি বেদ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং খনা, লীলাবতী প্রভৃতি অনেক রমণীই সাধারণতঃ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ক্রমে এ নিয়ম যে শক্তিহীন হইয়া আসিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। ক্রমে শাস্ত্রা-দেশ মধ্যে এ আদেশও স্পষ্ট হইয়াছিল যে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষ-নীয়াতি যত্নতঃ"—কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিবে ও শিক্ষা দিবে। ভারতবর্ষের দুই শ্রেষ্ঠ কবি—যথার্থ কবি নাম যোগ্য দুই কবি—কালিদাস ও ভবভূতি,—ইহাঁদের উভয়ের গ্রন্থেই স্ত্রী জাতির উন্নত ভাবের সপক্ষে মত প্রকাশিত আছে। কালিদাস বলেন,—

"স্ত্রী পুমানিত্য নাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাং।"

স্ত্রী কি পুরুষ সে বিষয় জানিবার প্রয়োজন নাই; সাধু ব্যক্তির চরিত্রই পূজনীয়। আবার ভবভূতির অরুন্ধতী সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা আরও উন্নত, কোমল ও হৃদয়গ্রাহী। যথা, "বৎসে!

শিশুর্ব্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতু তথা
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্ত্বয়ি তু মম ভক্তিং জনয়তি।
শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ॥"

হে বৎসে! তুমি শিশুই হও আর শিষ্যাই হও, যাহাই হও, সে সম্বন্ধ সেই রূপই থাকুক্। তোমার উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই আমার অন্তঃকরণে তোমার প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া দিতেছে। তুমি শিশুই হও, আর স্ত্রীলোকই হও, নিশ্চয়ই তুমি জগতের পূজনীয়, কারণ গুণই পূজার সামগ্রী, লিঙ্গ কি বয়স নহে।

এরূপ বাক্য কবির সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারত রমণীকে সকলেই একটি অপূর্ব্ব পিঞ্জরাবদ্ধ জীব বলিয়া ভাবিতেন না, সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যথার্থই দেবী বলিয়া মানিতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ভারতবালার অবস্থা যে অতি হীন ছিল, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

দান পত্র।

"ধনে সুখ নাই কিন্তু সুখ হয় মনে।"

পৃথিবীতে লোকে সচরাচর মনে করিয়া থাকে, যে আমাদিগের ধন বৃদ্ধি হইলেই আমাদিগের সুখ বৃদ্ধি হইবে; ইহার অপেক্ষা বিষম ভ্রম আর কিছুই নাই। ধন দ্বারা বাহিরের সম্পদ বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু পারিবারিক স্নেহ দয়া ও সদ্ভাবের যে বৃদ্ধি হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, বরং দুঃখের অবস্থায় যে পরিবারের মধ্যে নম্রতা, ক্ষমা, স্নেহ ও শান্তি বিরাজমান ছিল, ধনাগম হইয়া কত সময় তাহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে এবং গৃহ বিবাদে সে পরিবার উচ্ছিন্ন গিয়াছে। আমরা যে কথা বলিতেছি, তাহা কাল্পনিক নহে। আমরা একটী পরিবারের যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমাদিগের কথার সত্যতা দেখাইতেছি।

ডেবিড হণ্টার নামে সামান্য অবস্থার এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারের ন্যায় সুখী পরিবার প্রায় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। গৃহস্থ ও তাঁহার তিন পুত্র এক কারখানায় সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু তাহাতে কি? তাঁহারা যাহা পাইতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগের সুখের অভাব ছিল না।

ডেবিড হণ্টার আপনার সমপদস্থ লোক দিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তিনি ধীর, শান্ত, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান্। তাঁহার সন্তানদিগের প্রকৃতিও তাঁহার অনুরূপ ছিল। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তিনি, তাঁহার স্ত্রী, ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা। এই কন্যা দুইটী অত্যন্ত শ্রম পরায়ণা ও সুশীলা ছিল।

এই পরিবারস্থ সন্তানদিগের মধ্যে যেরূপ প্রণয় ছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব পদার্থ। যে ব্যক্তি ইহা দেখিত, সেই মোহিত হইত। গ্রামস্থ সকল

লোকেরই ইহা দৃষ্টিগোচর হইত। ধর্ম্মমন্দিরে যাইবার সময় তাহারা এক সঙ্গে যাইত, পরস্পরে পরস্পরের গলা ধরাধরি করিয়া চলিত, তাহারা এরূপ স্নেহে গলিয়া পরস্পরের সহিত কথা কহিত এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত, যে তাহা দেখিয়া লোকে সুখী হইত।

ধর্ম্মমন্দিরে গিয়াও তাহারা তিন সহোদর মাতা ও ভাগনী দ্বয়কে ধর্ম্ম-পুস্তকের উপদেশ ও স্তোত্র প্রভৃতি দেখাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। এ সকল সামান্য বিষয় হইলেও সূক্ষ্মদর্শী লোক সকল ইহার মধ্যে হৃদয়ের অনেক গূঢ়ভাব দেখিতে পান। তাহাদিগের গৃহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, দেখিলে সুখী হওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে পিতা ও সহোদরত্রয় কার্য্য করিয়া বাটীতে আসিলেন, তখনও কন্যাদ্বয় সেলাই কার্য্য করিতেছে, মাতা গৃহকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন। অগ্নি সেবনের জন্য পিতা এক হেলানে চেয়ারে অগ্নির ধারে বসিলেন, তিনটী সহোদর অন্যদিকে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কথোপ-কথন করিতে লাগিল। হণ্টার পরিবারের অবস্থা যত হীন হউক, তাহাদিগের সুখ অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইত।

তাহাদিগের মনিব ডেবিড ও তাঁহার পরিজনগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি কার্য্যালয়ের কার্য্য শেষ হইলে ময়দানে বেড়াইতে আসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এই পরিবারকে দেখিয়া যাইতেন। তিনি যত বার আসিতেন, ডেবিডের সন্তানগণের শান্তভাব, প্রফুল্লতা এবং সস্নেহ ব্যবহার দেখিয়া কিছু না কিছু প্রশংসা করিয়া যাইতেন। তিনি প্রতিবারই এই পরিবারের গার্হস্থ্য শান্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন এবং প্রতিবারই তাহা তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইত।

প্রভু এক একবার হাস্য করিয়া বলিতেন "ডেবিড তোমার পরিবারের মধ্যে অপ্রণয় ঘটান সহজ নহে। তোমার গৃহে যে শান্তি বিরাজ করিতেছে, আমি বোধকরি কিছুতেই তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না।"

ডেবিড শান্ত ও নম্রভাবে বলিতেন আমরা গরিব, আমি বোধকরি, কিছুতেই আমাদিগের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে না। আমাদিগের মধ্যে কখন কোন অনৈক্য হয় নাই এবং বোধকরি কখনই হইবে না।" পুত্রকন্যাগণ সলজ্জ-ভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়া এবং প্রতিপালকের মুখ পানে চাহিয়া ঈষৎ

হাস্য করিত। সেই হাস্য যেন স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিত " আমাদিগের মধ্যে বিবাদ! না, না কখনই হইতে পারে না। আমরা পরস্পরকে একান্ত অন্তরে প্রাণের সহিত ভাল বাসি।"

এইরূপে কয়েক বৎসর চলিয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে আর কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না, কেবল ডেবিড ও তাঁহার স্ত্রী কিছু প্রাচীন হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের পুত্র কন্যাগণ বয়স্ক হইতে লাগিল। তাহাদিগের সুখভোগ ও স্নেহের বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না।

একদিন সন্ধ্যাকালে ডেবিড হন্টার পরিবারদিগকে লইয়া অগ্নি সেবন করিতেছেন, এমত সময়ে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল। তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই লোক ডেবিডকে একখানি পত্র আনিয়া দেয়, তাহা অতি কুৎসিতরূপে ভাঁজা, কদর্য্য অক্ষরে শিরোনামাঙ্কিত এবং সামান্য আটা দিয়া যোড়া। তাঁহার তন্তুবায় ব্যবসায়ী ভ্রাতার নিকট হইতে সে পত্র খানি আইসে। দুই বৎসরকাল ডেবিড তাহার নিকট হইতে আর কোন পত্রপান নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পত্রখানি ভিন্ন-প্রকার—পরিষ্কৃতরূপে যোড়া, গালা দিয়া সিল মোহর করিয়া আঁটা এবং আফিসের চিটীর ন্যায়। ডেবিড পত্র খানি এক হস্তে লইয়া জামার জেবে অন্য হস্ত দিলেন এবং তথা হইতে চসমা বাহির করিলেন। তৎপরে আস্তে আস্তে চসমা খুলিয়া নাকে দিয়া চিটী খুলিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিজন গণ আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, তিনি এইরূপে পত্রখানি পড়িলেন :—

মহাশয় আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে জেমেকার মৃত জন পিট তাঁহার উইলে আপনার নামে ৫০,০০০ টাকার দান পত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা আপনাকে কেবল বিষয়টী জানাইলাম, কিন্তু আপনি কিরূপ উপায়ে, কোন সময়ে উক্ত টাকা পাইবেন, দুই এক দিন মধ্যে তাহার সংবাদ লিখিয়া পাঠাইতেছি।

বশম্বদ।

গ্রিপি ও থ্রেপ্সন সলিসিটর দ্বয়।

এই পত্রপাঠে ডেবিড ও তাঁহার পরিবারদিগের মনে যে কি ভাবোদয় হইল, তাহা পাঠিকা একবার চিন্তা করিলে বুঝিতে পারেন। দাম পত্র সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। দাতা একজন দূর সম্পর্কীয় লোক। ডেবিডের সহিত তাঁহার কখন পত্রালাপ ছিল না, এমন কি তিনি যে আছেন, ইহাও ডেবিড জানিতেন না।

হণ্টার পরিবার তাহাদিগের এই আকস্মিক সৌভাগ্যের বিষয় গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও প্রতিবেশীদিগের মধ্যে তাহা প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল ডেবিড পরিবার ইতিপূর্ব্বেই সুখী ছিল, এখন দশগুণ সুখী হইবে। এরূপ মনে করা যুক্তি সঙ্গত, কারণ সামান্য আয়ে যাহারা সুখী, প্রচুর আয়ে কেন না অধিক সুখী ও সন্তুষ্ট হইবে? অধিক ধনী হইয়া তাহারা অধিক সুখী হইবে, ইহা যুক্তি সঙ্গত বটে, কিন্তু কতদূর হইল দেখা যাউক।

কিছুদিনের মধ্যে ডেবিডের লণ্ডনস্থ সলিসিটারেরা দানপত্রের সবিস্তার বিবরণ তাঁহাকে লিখিলেন এবং তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ দিলেন, তাহাতে ৩ মাসের মধ্যে সমুদায় টাকা তাঁহার হস্তগত হইল। ইহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত পরিবারের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সৌভাগ্য হইলে লোকে যেরূপ অহঙ্কারী ও আড়ম্বরপ্রিয় হয় ইহাদিগের ভিতর সেরূপ কিছু দৃষ্ট হইল না। তিন চারি সপ্তাহ যায়, তাহারা এক রবিবার ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেছে যাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বের স্নেহ বাৎসল্য জানিত, তাহারা এখন উহাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। পূর্ব্বে তাহারা পরস্পরের গলা ধরাধরি করিয়া সহাস্য বদনে আসিত, সে দিন লোকে দেখিল, তাহারা পরস্পর হইতে অনেক দূরে ছাড়াছাড়ি হইয়া আসিতেছে। তাহাদিগের সকলেরই মুখে রাগ এবং অসন্তোষের চিহ্ন দেদীপ্যমান। যাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বের মুখশ্রী দেখিয়াছে, তাহাদিগের চক্ষে ইহা অলক্ষিত রহিল না।

হণ্টার পরিবারের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর দেখিয়া লোকে বিস্ময়াম্বিত হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছে কি না, এবং যদি ঘটিয়া থাকে, দান পত্র তাহার কারণ কি না, জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যে যে পরিবারের শান্তিভঙ্গ করিতে পারে নাই, সৌভাগ্যে যদি তাহা করে, তাহা হইলে যার পর

নাই আশ্চার্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে। এক সময় হণ্টারদিগের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তখন কর্ম্মকার্য্য ছিল না, অথচ পীড়াতে বিষম কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল। সে সময় পরিবারদিগের স্নেহাকর্ষণ আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন কি তাহার বিপরীত হইল? ইহাদিগের বৃত্তান্ত পর পর অবগত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

দান পত্র পাইবার তিন দিন পরে ডেবিড হণ্টার পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া আপনার চারিদিকে বসাইলেন এবং বলিলেন তিনি দানপ্রাপ্ত টাকা পরিজন-দিগের সকলের মধ্যে বণ্টন করিবার একটী ব্যবস্থা করিতে চান। পরে পুত্র তিনটীকে কারবারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যাহাকে যত টাকা দিতে চান উল্লেখ করিলেন এবং কন্যাগণের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ যে টাকা দিবেন তাহাও বলিলেন। আপনার কথা শেষ করিয়া ডেবিড পুত্র কন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, তিনি নিশ্চয় মনে করিলেন, তাহারা তাঁহার সুবিবেচনার জন্য ধন্যবাদ করিবে। কিন্তু সকলের মুখে নিরাশা ও অসন্তোষের জাজ্বল্যমান নিদর্শন দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রহিল না, কি পুত্র, কি কন্যা কেহই পিতৃদত্ত অংশ লাভে সন্তুষ্ট হইল না।

দুর্ভাগ্য ডেবিড হিসাবের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া তাহাদিগের মনের মত করিবার চেষ্টা করিলেন তাঁহার নিজের জন্য যে স্বল্প বিত্ত রাখিয়াছিলেন তাহাও কমাইয়া সন্তানদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শিল না। তিনি যত প্রকার বণ্টন বা ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন, তাহার কিছু সন্তানদিগের মনের মত হইল না। তাহারা প্রকাশ্যরূপে কোন প্রতিবাদ করিল না, উচ্চ বা ক্রোধব্যঞ্জক কোন শব্দও প্রয়োগ করিল না, কিন্তু প্রত্যেকের মুখ ভাব, প্রত্যেকের আকার ইঙ্গিতে ঘোর অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এই সময় হইতে ডেবিড হণ্টারের পরিবার মধ্যে আর কোন সুখশান্তি রহিল না। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষ ভাব জন্মিল, তাহা আর কিছুতেই নির্ম্মূল হইবার নয়। দুর্ভাগ্য ডেবিড ইহা দেখিয়া দারুণ মর্ম্মব্যথা প্রাপ্ত হইল। দানপত্র তাঁহার হস্তে না আসিয়া সমুদ্র জলে চিরমগ্ন হইয়া থাকিলে ভাল হইত, তিনি সহস্র ২ বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পারিবারিক

শান্তি নাশের পূরণ কিসে হইবে? প্রতিবাসীরা যে ভাবান্তর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল, তাহার মূল কোথায় এখন বুঝা গেল।

ডেবিড ডক্টার দেখিলেন তাঁহার সন্তানেরা প্রাতঃ মধ্যাহ্ন রাত্রি সকল সময়েই পরস্পরের প্রতি দ্বেষাদ্বেষি করিতেছে এবং তাহাদিগের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপনের উপায় নাই। তখন তিনি আপনার ইচ্ছার বিপরীত হইলেও পরিবারদিগকে পৃথক্ ২ করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি প্রত্যেক পুত্রকে স্বতন্ত্র বাসস্থান নিরূপণ করিয়া নিজের আয়ে কারবার করিতে বলিলেন এবং যাহাকে যে টাকা দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ দিতে চাহিলেন। পুত্রেরা সন্তুষ্ট না হইয়া উচ্চও ভাবে পিতার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং কয়েকদিবসের মধ্যে পিতৃভবন পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাদিগের একদূর কোপ যে কোথায় যাইবে এবং কি করিবে পিতাকে একবার বলিল না।

সন্তানেরা অতঃপর আর কখন পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় রাখিল না। প্রত্যেকে মনে করিল অন্যে যতদূর উপযুক্ত, তদপেক্ষা অধিক পাইয়াছে এবং সে নিজে সকলের কম পাইয়াছে, ইহাতে যাবজ্জীবনের মধ্যে আর কেহ কাহার নিকট গেল না, পরস্পরের প্রতি ঘোর শত্রুভাব বৃদ্ধি হইল। তাহাদিগের কেহ আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল না, সকলেই একবাক্যে, তাঁহাকে অন্যায় পক্ষপাতী বলিয়া গ্লানি করিতে লাগিল।

দান পত্রের পরিণাম এই। এখন পাঠিকাগণ ভাবিয়া দেখুন ধনে লোকের কতদূর সুখবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

কঙ্কাল।

পাঠিকাগণ! পরপৃষ্ঠার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইবেন না। ইহা ভূত নহে, আমাদিগেরই শরীর। তবে ইহাতে মাংস, শিরা, ধমনী, চর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই নাই, ইহা কেবল অস্থিময় শরীর বা হাড়ের গঠন। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে সর্ব্বাগ্রে যেমন খড় জড়ায়, পরে তাহার উপর মাটী, খড়ি ও রঙ দেয়, আমাদের শরীরের সেই রূপ সকলের ভিতর অস্থি, পরে অন্যান্য আবরণ। অস্থিময় শরীরকে কঙ্কাল বলে। এই কঙ্কালই শরীরকে দৃঢ় করিয়া রাখে। কঙ্কাল না থাকিলে শরীরের কোন বল সামর্থ্য থাকিত না। কিন্তু এই কঙ্কাল একখানি

অস্থিদ্বারা গঠিত নহে, তাহা হইলে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ইচ্ছামত চালিত হইতে পারিত না। কঙ্কাল একটী কলের ন্যায় এবং নানা অস্থিময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গঠিত।

মানব কঙ্কালে বা অস্থি দেহে সমুদায়ে ২৯৪ খানি অস্থি আছে।

মেরুদণ্ড (পিঠের দাঁড়া)	২৬ খানি		৫৪
করোটী (মাথার খুলি)	৮	বক্ষ পঞ্জর প্রভৃতি	২৬
কর্ণাস্থি	৬	ঊর্দ্ধ শাখা (হস্ত)	৬৪
মুখাস্থি	১৪	অধঃ শাখা (পদ)	৬০
	৫৪		২০৪

ইহা ভিন্ন দন্ত প্রভৃতি আরও ৯০ খানি অস্থি আছে। কিন্তু অস্থির সহিত ইহাদিগের সম্যক্ সৌসাদৃশ্য নাহি বলিয়া ইহাদিগকে স্বতন্ত্র রূপে গণনা করা হয়।

অস্থিতে এক তৃতীয়াংশ দৈহিক ও দুই তৃতীয়াংশ পার্থিব পদার্থ আছে। দৈহিক পদার্থে অগ্নির তাপ দিলে সিরীষের ন্যায় গলিয়া যায়। পার্থিব পদার্থের মধ্যে দুই তিন প্রকার চূর্ণের ভাগই অধিক। চূর্ণ এত অধিক থাকাতেই অস্থি দৃঢ় ও শক্ত হয়। দৈহিক পদার্থ অস্থির ভিতর আটার ন্যায় কার্য্য করে। উহা দ্বারা অস্থির পরমাণু সকল দৃঢ় সংবদ্ধ হয়, এজন্য অস্থি সহজে ভাঙ্গে না। একটী প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সমগ্র কঙ্কাল ওজনে পাঁচ ছয় সের হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে মানবাস্থির উপরিভাগ মসৃণ ও দৃঢ়, কিন্তু এই দৃঢ় আবরণের ভিতর সচ্ছিদ্র স্পঞ্জের ন্যায় পদার্থ আছে। হস্ত ও পদ এই শাখাদ্বয়ের অস্থি নলের ন্যায় লম্বা ও ফাঁপা, মধ্য দেশ মজ্জাতে পূর্ণ। ইহাতে মানব দেহের শাখা চতুষ্টয় এক কালে লঘু অথচ সুদৃঢ় হইয়াছে। অস্থি এত দৃঢ় হইলেও তাহার মধ্য দিয়া শিরা সকল সঞ্চারিত হয়; নতুবা ইহা সজীব থাকিতে বা পরিপুষ্ট হইতে পারিত না।

করোটীস্থ অস্থিগুলির পরস্পর সংযোজন প্রণালী অতি সুন্দর। যে দুই অস্থি পরস্পর সংযুক্ত হইবে, তাহার ধার করাতের ন্যায়। ইহাতে অস্থিদ্বয় পরস্পর এত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হয় যে আঘাত করিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে তথাপি খুলিবে না। ললাট ফলকে এই যোজনা স্থলে যে দাগটী দেখা যায় উহাকে নির্ব্বোধ সাধারণ লোকে বিধাতার লিপি বলিয়া থাকে। করোটীস্থ অস্থিগুলি পরস্পর এরূপে সংনিবদ্ধ যে উহাতে একটী সুদৃঢ় খিলান নির্ম্মিত হইয়াছে। জগদীশ্বর যদি উহাকে এত শক্ত না করিতেন, তাহাহইলে মানব দেহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ নানা বিপদ্ সঙ্কুল হইয়া থাকিত। বাস্তবিক মস্তিষ্ক সুরক্ষিত থাকিবে বলিয়াই করোটীর সুদৃঢ়তা এত দূর আবশ্যক হইয়াছে।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। রুসিয়া তুরুষ্কের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। এখনও উভয় পক্ষের জয় পরাজয় প্রায় সমতুল্য। তুরুষ্কের প্রজাদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহী হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে এটী তুরস্কের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। ইংলণ্ড বর্ত্তমান যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

২। মহারাণী বিক্টোরিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বিট্রিস ও প্রিন্স লিওপোলডকে সঙ্গে লইয়া স্কটলণ্ড ভ্রমণ করিতেছেন।

৩। মান্দ্রাজের মৃত গবর্ণরের পত্নী লেডী হোবার্ট এ দেশীয়দিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী। তিনি মান্দ্রাজের কাঙ্গাল গরিবদিগকে ১৩০৭ খণ্ড বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন।

৪। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী রাণী বিশ্বেশ্বরী দেবী ময়মনসিংহ হাসপাতালে একজন আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন নিয়োগ জন্য ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুনানগরে সম্ভ্রান্ত গৃহে প্রথম বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম রঘুনাথ বাবাজী, বয়স ৩৫, কন্যার নাম তেঙ্গু বাই, বয়স ২৫ বৎসর।

৬। আগ্রানগরের বিখ্যাত দেশহিতৈষী বাবু নবীনচন্দ্র রায় অনাথ ও বিধবাদিগের জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, এই আশ্রমের সাহায্যার্থ অমৃতসরের সর্দার দয়াল সিং ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। নিরাশ্রয় বিধবা বা অনাথ সন্তান মাত্রকেই নবীন বাবু আশ্রয় দান করিতে কৃতসঙ্কল্প আছেন। এ জন্য নিজ হইতে মাসে মাসে তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইতেছে।

৭। নেপালের মহারাজা জঙ্গ বাহাদুর পরলোক গত হইয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার ৩টী স্ত্রী তাঁহার সহমৃতা হইয়াছেন। নেপাল অদ্যাপি স্বাধীন রা[illegible]হিয়াছে, জঙ্গ বাহাদুর যেমন ক্ষমতাশালী, তেমনি রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিয়া ইংরাজেরা অনেক উপকৃত হইয়াছেন।

৮। স্যর রিচার্ড টেম্পল বোম্বাইয়ের গবর্ণর এবং আসলী ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সন্তানগণ ইংলণ্ডীয় ধনাগার হইতে নিম্ন লিখিত পরিমাণে বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন ঃ—প্রিন্সেস রয়াল বা জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ৮০ হাজার, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ৪ লক্ষ, যুবরাজ পত্নী ১ লক্ষ, রাজকুমার আলফ্রেড, ডিউক অব এডিনবর্গ ২॥০ লক্ষ, রাজকুমার আর্থর ও লিওপোলড প্রত্যেকে ১॥০ লক্ষ, রাজকুমারী আলিস, হেলেনা ও লুইস প্রত্যেকে ৬০ হাজার টাকা মাত্র।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। জীবনালেখ্য—কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ীর জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মময়ী একটী রমণী রত্ন ছিলেন। সরলতা, দয়া ও সৌজন্য তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল। একজন প্রভূত উপার্জনশীল স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। এ কালের রমণীগণের ন্যায় স্বামীর সকল বিত্ত আপনি সম্ভোগ করিবেন, এরূপ তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার উদার-স্বভাব স্বামী অনেক দীন দুঃখী নিরাশ্রয়দিগকে প্রতিপালন করিতেন, ব্রহ্মময়ী আনন্দের সহিত এই মহৎ কার্য্যে স্বামীর সহকারিতা করিতেন। তাঁহার গৃহে অনেকগুলি অনাথা বালিকা আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তিনি সন্তান নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতেন। আপনার এবং সন্তানগণের কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি আশ্রিত দিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। সমাজ সংস্কার কার্য্যে তিনি অন্তরের সহিত সহানুভূতি ও সহায়তা করিতেন। বিধবা এবং বয়স্কা কুলীন কন্যাদিগকে তিনি কন্যার ন্যায় প্রতিপালন ও উপযুক্ত পাত্রসাৎ করিয়া সুখী হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এমন নারীকুলের আদর্শ রমণী ৩১ বৎসর মাত্র বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগ ক্লেশ তাঁহার স্বামী ও আত্মীয়গণ যে শীঘ্র ভুলিতে পারিবেন না বলা বাহুল্য।

বামাগণের রচনা।

পূর্ণিমা।

অপূর্ব্ব পূর্ণিমা তিথি কিবা মনোহর।
শোভা দরশনে মুগ্ধ মানব অন্তর॥
শেফালিকা তরুবর কুসুম ফুল দলে।
গাঁথিয়া চিকণ হার পরিয়াছে গলে॥
বিকসিত স্থলপদ্ম কিবা রূপ তার।
শ্বেত বস্ত্র পরি বেল প্রসবে নিহার॥
রজনীগন্ধের গন্ধে বায়ু সুবাসিত।
অঙ্গরাগে কৃষ্ণকলি আছে প্রফুল্লিত॥
জুতি জাতি সুমালতী জবা বিকশিত।
শশাঙ্ক আলোকে অতি মন প্রফুল্লিত॥
গন্ধরাজ গন্ধরাজি কিবা মনোহর।
নিরুপম শোভা হায়! দেখিতে সুন্দর॥
কস্তুরা কেতকী আদি ফুটিয়াছে কত।
দেখিয়া প্রসূন শোভা মন হরষিত॥
নিশিরাজ পৌর্ণমাসী শুভ তিথি পেয়ে।
বিতরিছে সুধারাশি ভাণ্ডার খুলিয়ে॥
এসুখ সময় পেয়ে চকোরী চকোর।
শূন্য দেশে সকৌতুকে রঙ্গরসে ভোর॥
অদূরে কাননে ছাড়ি সুমধুর তান।
থাকি থাকি কোন পাখি সুখে করে গান।
এ সুন্দর নিশি শোভা করি দরশন।
আনন্দ সাগরে চিত্ত হইল মগন॥
অতল সাগর গর্ভে করিয়া গমন।
কোন্ জনে নাহি ইচ্ছে লভিতে রতন?

সুশীতল সমীরণ করিতে সেবন।
ধরাতলে বাঞ্ছা নাহি করে কোন্ জন?
প্রবেশিতে প্রফুল্লিত কুসুম কানন।
কোন্ মানবের নহে ব্যাকুলিত মন?
সেরূপ কল্পনা রাজ্যে প্রবেশিতে আশা।
সহায় সম্বলহীনা, ঈশ্বর ভরসা।
করুণা করিয়া বিধি পুরাইলে আশ।
ক্রমশঃ মনের বাঞ্ছা করিব প্রকাশ॥

শ্রীমতী শশীমুখী দাসী। বগুড়া, মাষ্টার পাড়া —

হবরে যোগিনী ত্যজিব সংসার।

" হবরে যোগিনী ত্যজিব সংসার "
কাননে ভ্রমিব, বৃক্ষ তলে রব,
বন ফল তুলি করিব আহার।
বেড়াব বিজনে, বন্য জন্তু সনে,
কহিব তাদেরে মনের বেদন,
জুড়াবে হৃদয়, বলি সমুদয়,
হইবে শীতল সন্তাপিত মন॥
তটিনী তটেতে, ভ্রমিব সুখেতে,
হেরিব তাহার হাসি হাসি মুখ॥
শৈবলিনী সনে, প্রফুল্লিত মনে,
কহিব বচন ঘুচাইব দুঃখ॥
যত দুঃখ হায়, বলিব তাহায়,
মিশাব তাহাতে নয়নের জল।
বাসনা নিচয়, জানাব তাহায়,
মানবে না কব মন্ত্রণা সকল।

কি হবে জানালে, মানব সকলে,
পর দুঃখে তারা করে না রোদন।
এই সে কারণ, তটিনী সদন,
নিবেদিব দুঃখ খুলিয়া জীবন॥
বেড়াব কান্তারে, হেরিব ভূধরে,
হেরিব নির্ঝর মনের হরষে।
তরু লতা যত, হেরিব তাবত,
বেড়াব সর্ব্বদা মনের উল্লাসে॥
ডাকিব তাঁহারে, মাতি প্রেম ভরে,
যত দুঃখ সব হইবে খণ্ডন।
সর্ব্বদা ডাকিব, বাধা না পাইব,
আনন্দে পূজিব তাঁহার চরণ॥
লভিয়ে স্বাধীনে, বেড়াব বিজনে,
পরাধীনে দূর করিব তখন।
হায় রে! সে দিনে, পাইব কেমনে,
নিয়ত আকুল হতেছে জীবন॥
হবরে যোগিনী ত্যজিব সংসার।
বাসনা মনেতে, নিবিড় বনেতে,
হৃদয়ের দুঃখ করিব প্রচার॥
আপনি কাঁদিব, আপনি শুনিব,
আর কে শুনিবে কে আছে এমন?
আছেরে যাহারা, নাহি জানে তারা,
পরের দুঃখেতে করিতে রোদন।
বিহঙ্গ নিকরে, বসি বৃক্ষোপরে,
করিবে সবেরে মধুর কূজন।
তাহাই শুনিব, তাতে যোগ দিব,
বুঝিব তাহাই করিয়া মনন॥

স্বাধীনতা ধনে, রাখিব যতনে,
হৃদয় মাঝেতে স্থাপিত করিয়া।
মনেতে বাসনা, ঘুচায়ে যাতনা,
পূরাব কামনা যোগিনী হইয়া॥
চাহি না বিভব, চাহি না গৌরব,
চাহি না চাহি না অলীক সংসার।
কোথা রবে সব, যবে হবো শব,
কোথায় রহিবে আমার আমার॥
অতএব তাই, কিছুই না চাই,
বাসনা সদাই যোগিনী হইতে।
ত্যজিয়া বসন, ভস্মেতে লেপন,
করিব শরীর, মনের সাধেতে॥
যবেরে কান্তারে, বিহঙ্গ নিকরে,
মনের আনন্দে বিভু গুণ গাবে।
শুনি সেই গান, জুড়াইব প্রাণ,
হৃদয়ের জ্বালা সব দূরে যাবে॥
তাহারা কেমন, হয়ে হৃষ্ট মন,
ডাকিছে সতত সেই দয়াময়ে।
না পাইয়া বাধা, আহ্লাদে সর্ব্বদা,
নিয়ত গাইছে প্রফুল্ল হৃদয়ে॥

হরিমতি। কাল্না।

No. 168 August 1877.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

সচিত্র।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৬৮ সংখ্যা } শ্রাবণ—বঙ্গাব্দ ১২৮৪। { ১৩শ ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভার নিমিত্ত
ভারতসংস্কার যন্ত্র হইতে
প্রকাশিত।

হরিনাভি।
PRINTED AND PUBLISHED BY T. N. CHUCKERBURTI,
AT THE EAST INDIA PRESS, HARINAVI.

মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ডাকমাহুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে একমাসের অধিক বিলম্ব হইলে মফঃস্বলের পত্রিকা বন্ধ হইবে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

৪। যাণ্মাসিকের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র যাণ্মাসিকের এই দুই মাত্র সময় থাকিবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য ... ... ২।০

মফঃস্বলের [ডাকমাহুল সমেত] ২৷৵০

অগ্রিম যাণ্মাসিক মূল্য।

কলিকাতার জন্য ১৶০

মফঃস্বলের [ডাকমাহুল সমেত] ১।৴০

প্রতিখণ্ডের মূল্য ... ... ।০

একেকালে ১২ খণ্ডের মূল্য ... ২॥০

ঐ ৬ ... ... ১।০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৬৮ সংখ্যা } শ্রাবণ—বঙ্গাব্দ ১২৮৪। { ১৩ শ ভাগ।

মিস মেরী কার্পেণ্টার।

ইংরাজী ১৮০৭ সালে ইংলণ্ডের একসিটর নামক স্থানে এই সুবিখ্যাত রমণীর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা এক জন ধর্ম্মপরায়ণ, সদ্বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম যাজকতা কার্য্য করিতেন। তিনি স্বয়ং কন্যাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন।

মেরী কার্পেণ্টারের বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা একসিটার পরিত্যাগ করিয়া ব্রিষ্টল নগরে গমন করেন। মেরী সেখানে পিতার নিকট বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। জ্ঞানের উদয় হওয়া অবধি তাঁহার অপরকে শিক্ষা দিবার অনুরাগ প্রকাশ পায়। তিনি প্রথম প্রথম স্বীয় জনকের সহকারী হইয়া তাঁহার পিতার বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং তদ্ভিন্ন রবিবার পাড়ার দরিদ্রের সন্তানদিগকে একত্র করিয়া শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই একটী চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হয়, তিনি দরিদ্রের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে গিয়া দেখিলেন যে অনেক বালক বালিকা বালককাল হইতেই পিতা মাতার উপদেশে দুষ্কর্ম্ম করিতে শিখে। চুরি, প্রতারণা প্রভৃতি ভিন্ন জীবন ধারণের উপায় নাই

ভাবিয়া তাহাদের পিতা মাতা তাহাদিগকে ঐ সকল বিষয়ে উৎসাহিত করে। অপরাধ করিয়া তাহারা যখন ধৃত হয়, তখন তাহাদিগকে কারাগারে দেওয়া হয়। কারাগারে গিয়া কোথায় তাহাদের পাপ প্রবৃত্তি দমন হইয়া আসিবে, না, তাহারা সেখানে তাহাদের অপেক্ষা বড় বড় ও পাকা বদমায়েস-দিগের সহিত মিলিয়া আরও বিকৃত-স্বভাব হইয়া আসে। মেরী কার্পেণ্টার ভাবিলেন কারাবাসের অবস্থায় এই সকল বালক বালিকাকে যদি কোন প্রকার সদুপদেশ দেওয়ার নিয়ম করা যায় কিম্বা কোন প্রকার কার্য্য করিয়া উপার্জ্জন করিতে শিখান যায়, তাহা হইলে তাহাদের পাপ প্রবৃত্তি দমন হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি প্রথমে নানা স্থান হইতে ঐরূপ কারারুদ্ধ বালক বালিকা-দিগের অবস্থাদি বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি যতই দেখিতে লাগিলেন, যতই তাহাদের সহিত মিশিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে তাহাদের জন্য কিছু করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। সবলকায় পুরুষেরা রক্ষক সমভিব্যাহারে না লইয়া যে সকল বদমায়েসের আড্ডায় যাইতে পারিতেন না, এই পর দুঃখ-কাতরা রমণী নির্ভয়ে সেই সকল স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে স্নেহ দয়া ভালবাসা ও সদুপদেশ প্রভৃতি দ্বারা বশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন একটী বালক বা বালিকাকে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে তিনি তাহাকে সদুপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, কিন্তু তাহার বাড়ী অন্বেষণ করিয়া তাহার পিতা মাতার নিকট গিয়া তাহাদিগকেও সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে সদুপদেশ দিতেন, এবং এই কার্য্যে জীবন কাটাইবেন মনে করিয়া বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে কারাবন্দী বালক বালিকাদিগকে সদুপদেশাদি দ্বারা কিরূপে অসৎপথ হইতে ফিরাইবার উপায় করা যায় এই চিন্তায় তিনি দিন দিন নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায় সুতরাং তাঁহাকে অধিক দিন একাকিনী পরিশ্রম করিতে হইল না; তাঁহার ব্যগ্রতা ও একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক ভদ্র পুরুষ ও রমণীর সেই প্রবৃত্তি জন্মিল। এই সময়ে হিল নামক এক জন দয়াবান্ সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে ব্রিষ্টল নগরে আসিয়া বাস করিলেন, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কুমারী কার্পেণ্টারের সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রিষ্টল নগরেই উক্ত মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করা হইল। কারারুদ্ধ বালক

বালিকাদিগকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য "জুভিনাইল রিফারমেটরি" নামে কতক গুলি চরিত্র শোধক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সে জন্য লোকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। হিল প্রভৃতি জন কয়েক ভদ্রলোক অপরাধী বালকদিগের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন এবং মেরী কার্পেণ্টার বালিকাদিগকে সৎশিক্ষা দিবার ভার লইলেন।

এই সময়ে ব্রিষ্টলে রেডলজ নামক একটী বড় বাড়ী বিক্রয় হইয়া যায় শুনিয়া মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার পরিচিতা এক জন ধনবতী রমণীকে তাহা কিনিয়া তাঁহার "রিফারমেটরির" জন্য ভাড়া দিবার অনুরোধ করিলেন; উক্ত ধনী রমণী মেরীকে এত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার সদাশয়তা দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে অনুরোধ করিবামাত্র সেই বাড়ীটী কিনিয়া দিলেন। তদবধি এই পর-দুঃখ-কাতরা রমণী সেই বাড়ীতে আপনার রিফারমেটরি বিদ্যালয় রাখিয়া স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া রহিলেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয়ের ভার লন, তিনি প্রথমে এরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত না হওয়াতে তিনি ভিক্ষা করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় চালাইতে লাগিলেন। তবে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া যে সকল বালিকা কোন প্রকার গুরুতর অপরাধে অধিক দিনের জন্য কারাবন্দী হইত, তাহাদিগকে তাঁহার হস্তে দিতেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া রেডলজ নামক বাটীতে রাখিয়া শাসন এবং সদুপদেশ উভয় উপায়ে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছাত্রী সংখ্যা প্রথমে ৪০ টী ছিল, ক্রমে ৬০ টী পর্য্যন্ত হইল। মেরীর সুব্যবস্থা গুণে এই সকল বিদ্যালয় অতি সুন্দররূপ চলিতে লাগিল। বৎসর বৎসর সেই বিদ্যালয় হইতে দলে দলে বালিকা সদাচার ও সৎপ্রবৃত্তি লইয়া বাহির হইতে লাগিল। কতকগুলি যায়, আবার কতকগুলি আসে। মেরী তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, যাহাতে তাহারা কারাবাস হইতে বাহির হইয়া ভদ্র গৃহস্থের ঘরে কর্ম্ম পায়, অথবা অন্য কোন জীবিকার উপায় লাভ করিতে পারে, যাহাতে আবার তাহাদিগকে উদরের জ্বালায় দুরাচারী হইতে না হয়, এজন্য রিফরমেটরি হইতে বাহির হইলেই তাহাদিগকে কাজ কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে মিস মেরী কার্পেণ্টারের এবং তাঁহার

রিফারমেটরির সুখ্যাতি দেশে এরূপ রাষ্ট্র হইল যে তাঁহার রিফারমেটরির বালিকা শুনিলেই লোক যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে কার্য্য দিত। এইরূপে গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে কত শত বালিকা তাঁহারা শিক্ষা গুণে দুষ্প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা পাইয়া কেহ গৃহস্থের গৃহে পরিচারিকার কাজ পাইয়াছে, কেহ জীবিকার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছে, কেহ বা বিবাহিতা হইয়া পতি পুত্রাদি লইয়া সুখে ঘর কন্না করিতেছে। এ কথা স্মরণ করিলে কাহার মনে না আনন্দ হয়; এবং উক্ত পরলোক-গতা রমনীকে শত মুখে ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়?

সকলি হইল, কিন্তু তথাপি একটী বিষয় অবশিষ্ট রহিল। মিস্ কার্পেন্টার দেখিলেন যে যাহাদের পাপ-প্রবৃত্তি এতদূর বাড়িয়াছে যে সে জন্য কারাগারে আসিয়াছে কেবল তাহাদিগকে সংশোধন করিলে চলিবে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের পাপ প্রবৃত্তি আজিও সেরূপ প্রবল হয় নাই, আর কিছু দিন পরে যাহাদিগকেও হয়ত কারাগারে যাইতে হইবে এরূপ বালক বালিকাদিগের জন্য যাহাতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সে জন্য তিনি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এ বিষয়ে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার যথেষ্ট নাম সম্ভ্রম হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অনুরোধে অনেক পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য পার্লেমেণ্টে ঐ প্রস্তাব তুলিতে স্বীকৃত হইলেন; অনেক দিনের বাদানুবাদের পর কয়েক বৎসর গত হইল মিস্ কার্পেণ্টারের পরামর্শানুরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এইরূপে ৩০ বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টার পর যখন তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল, তখনই ঈশ্বর যেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন। তাঁহার চরিত্র যেমন উৎকৃষ্ট ছিল, মৃত্যুও তেমনি সুখে হইয়াছে। ১৪ ই জুন বৃহস্পতি বার রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত তিনি সমুদায় গৃহ কর্ম্ম দেখিলেন, যাহাকে যাহা বলিবার বলিলেন, যাহাকে যাহা লিখিবার লিখিলেন। পরে শয্যাতে শয়ন করিলেন। পর দিন প্রাতে দেখা গেল যে তিনি শয্যাতে মৃত আছেন। পরীক্ষাতে বোধ হইল, তাঁহার কোন প্রকার মৃত্যু যন্ত্রণা হয় নাই।

আমরা যে, এই রমনীর জন্য এত খেদ করিতেছি তাহার কারন আছে। তিনি এ দেশের লোকদিগের বড় বন্ধু ছিলেন। আমাদের দেশের বিখ্যাত

রাজা রামমোহন রায় যখন ১৮৩০ সালে ইংলণ্ডে যান, তখন তিনি ইহাঁরই পিতার অতিথি হইয়া থাকেন। রামমোহন রায়, পিতার বন্ধু বলিয়া মেরী তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিতেন। ইহাঁদেরই বাড়ীতে উক্ত রাজার মৃত্যু হয়। ইহার পিতাই শোক পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার শরীর সমাহিত করেন। তদবধি মেরী রামমোহন রায়কে আপনার প্রাতঃস্মরণীয় লোকের মধ্যে গণনা করিতেন। বিলাতে যে যাহাকে ভাল বাসে বা ভক্তি করে, তাহার মস্তকের কিছু কেশ কাটিয়া রাখিবার প্রথা আছে। মিস কার্পেণ্টার রাজার মস্তকের কেশ মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত আপনার নিকট রক্ষা করিতেন। কেবল তাহা নহে, রাজা ইংলণ্ডে গিয়া কি কি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রতি ভক্তির সঞ্চার হওয়া অবধি ভারতবর্ষের প্রতিও তাঁহার মমতা জন্মে। এই জন্য তিনি চারিবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম ও শেষ এই দুই বার বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি প্রধানতঃ চারিটী বিষয়ে মনোনিবেশ করেন (১ম) এ দেশের সামাজিক উন্নতির সাহায্য করা; (২) স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য করা; (৩) বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের কলে যে সকল ক্ষুদ্র বালক বালিকা কাজ করে তাহাদিগকে সচরাচর অতিরিক্ত পরিশ্রম করান হয়, সেই অনিষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করা; (৪) এ দেশের কারাবাসীদের অবস্থার উন্নতি এবং এখানেও রিফারমেটরি স্থাপন করা। ভারতবর্ষে প্রথম আসার পর তিনি "ছয় মাস ভারত ভ্রমণ" বলিয়া দুই খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক পাকা কথা বলিয়াছিলেন। শেষ যাত্রার পর ইংলণ্ডে গিয়া তিনি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারিকে এ দেশে রিফারমেটরি স্কুল খুলিবার জন্য অনুরোধ করেন। ষ্টেট সেক্রেটারির অনুরোধে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় দুই খানি পত্র লিখিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের বিচারের নিমিত্ত অর্পণ করেন। পাঠক তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, এই সহৃদয়া রমণীর যত্নের ফল এ দেশেও ত্বরায় ফলিবে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আলিপুরের জেলের নিকট একটী বাটী নির্ম্মাণ হইতেছে, ঐ বাটীতে একটী রিফারমেটরি স্কুল খোলা হইবে। যে সকল বালক বালিকা কোন অপরাধে কারারুদ্ধ হইবে, তাহাদিগকে অন্য কয়েদীদিগের সহিত একত্র না রাখিয়া ঐ স্কুলে রাখিয়া তাহাদের চরিত্র শোধন করিবার চেষ্টা করা

হইবে। প্রিয় শ্রমজীবি! যিনি তোমাদের জন্য এবং আমাদের মাতৃ ভূমি ভারতবর্ষের জন্য এত ভাবিতেন তাঁহার সদ্‌গুণের বিষয় দুই চারি কথায় শেষ করা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু তোমাদিগকে বলিবার ইচ্ছা রহিল। (শ্রমজীবী হইতে উদ্ধৃত।)

শরীরের চর্ম্ম।

শরীরের চর্ম্ম পরিষ্কার রাখা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা সকলে ভাবেন না, এই জন্য এত পীড়াক্রান্ত হন। বিশেষতঃ অনেক বালক বালিকার শরীর মলিন থাকে, বলিয়া তাহাদিগকে একটা না একটা রোগছাড়া প্রায় দেখা যায় না। মনুষ্য-শরীরের চর্ম্মের যেরূপ রচনা, তাহাতে এরূপ হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর। চর্ম্ম মনুষ্যের প্রায় সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া আছে। এই চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম২ ছিদ্র পূর্ণ, এই জন্য চর্ম্মের মধ্য দিয়া শরীরের অতিরিক্ত রস ঘর্ম্মরূপে নিঃসৃত হইয়া যায়। শরীরে মলা জমিলে ছিদ্র সকলের মুখ রুদ্ধ হয়, সুতরাং ঘর্ম্ম ভালরূপে বহির্গত হইতে পারে না, এবং তাহাতে নানা প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়। ফুসফুস, মূত্রাধার এবং অন্যান্য প্রণালীদ্বারা শরীরের মলা বহির্গত হয় বটে, কিন্তু সে সকলে মিলিয়া যত মলা বাহির করে, একা চর্ম্ম তদপেক্ষা অধিক করিয়া থাকে। একজন মধ্যবিধ গঠনের মনুষ্যের শরীর হইতে ২৪ ঘণ্টায় /২॥ সের রস বহির্গত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে চর্ম্মের উপরিভাগ মৎস্য-শরীরের ন্যায় শল্ক বা আঁইসে আবৃত বোধ হয়। এক একটী আঁইস এত ক্ষুদ্র যে এক ধান প্রমাণ স্থানে তাহার ২৫০ টা আছে। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটী আঁইস পরীক্ষা করিলে দেখাযায় তাহার এক একটার মধ্যে ৫০০ ছিদ্র আছে, ইহার ভিতর দিয়া ঘর্ম্মরস বিনিঃসৃত হয়। অতএব ভাবিয়া দেখ যখন এক ধান প্রমাণ স্থানে বা এক বুরুলের ২০ ভাগের ১ ভাগ স্থানে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ছিদ্র আছে, তখন শরীরের সমস্ত চর্ম্মে কত ছিদ্র! ইহা কেহ গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না! আশ্চর্য্য অথচ যথার্থ এমন ব্যাপার আর কি আছে? এরূপ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হইয়া গঠিত না হইলে শরীরের আভ্যন্তরিক কার্য্যসকল সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইত না। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক

এই স্বাভাবিক ছিদ্রপথ সকল রোধ করিয়া যেন শারীর-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা সংঘটন না করি। প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক শরীরের চর্ম্ম পরিষ্কার রাখা প্রত্যেকেরই পক্ষে কর্ত্তব্য।

রাম বাবুর শ্বশুর বাটী গমন।

(১৬৭ সংখ্যার ৮৬ পৃষ্ঠার পর)

আমিরা শশী বাবু, রাম বাবু, কমলমণি প্রভৃতি সকলেরই কথা বলিয়াছি, কিন্তু কুমুদিনীর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কুমুদিনী বিনোদিনীর ব্যবহারে বড় চটিয়াছেন। রাম বাবু এতদিনের পর আসিয়াছেন, বিনোদিনী তাঁহার সহিত একবার দেখা করিল না, দুটা মিষ্ট কথা বলিল না, কি অন্যায়! বিনী বড় হিংসুকে।

কিছুক্ষণ পরে রাম বাবু ও শশী বাবু শুইতে চলিলেন, কমলমণি তাঁহাদিগের সঙ্গে আলোক লইয়া চলিলেন। রাম বাবু প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দুইটী শয্যা প্রস্তুত, দুইটীরই মশারি ফেলা সুতরাং তাহাদের ভিতরে কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। রাম বাবু শুইতে যাইতেছেন, এমন সময় শশী বাবু যেন কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আজ্ঞা না, ওটায় নয়, আপনি অপর বিছানায় যান!" রাম বাবু তাহাই করিলেন। এমন সময়ে শশী বাবু যেন কোন বিশেষ কাজ ভুলিয়াছেন, এই ভাণ করিয়া সেইখান হইতে চলিয়া গেলেন; কমলমণিও প্রদীপ লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ ২ চলিলেন। রাম বাবু অন্ধকারে রহিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন না যে কমলমণি বাহিরে শিকল দিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্ধকারে শুইয়া শশী বাবুর অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বোধ হইল যেন অপর বিছানা হইতে কে আস্তে আস্তে নামিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তিনি ভয়ে ও আশ্চর্য্যে বলিলেন "কেও?"—একটী বামাস্বর তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল" আঃ ও আবার কি, চুপ কর না।" রামবাবুর বোধ হইল যেন সে স্বর তিনি পূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছেন; কিন্তু এ স্থানে সেরূপ সন্দেহেরত তিনি কোন কারণই দেখিতে

পাইলেন না, সুতরাং তিনি কঠোর স্বরে পুনরপি বলিলেন "যদি ভাল চাওত, কে তুমি শীঘ্র বল।" বামাস্বর উত্তর করিল "ভাল নয়ত মন্দ কে কোন্ কালে চায়,কে আমি এখনি দেখিবে।" এই বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটী রামবাবুর অঙ্গে আপনার শীতল করপদ্ম বিন্যাস করিলেন। পুরাকালে ইন্দ্রের ঐরাবত যেমন দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মালা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, রামবাবু তেমনি সবেগে সেই বাহুলতা নিক্ষেপ করিয়া বিছানা হইতে লাফ দিয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকটী সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন; তাহাতে তাঁহার লাগিল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামবাবু সেই কুস্থান পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে একবারে দ্বারের দিকে গেলেন, গিয়া দেখেন বাহিরে শিকল দেওয়া। তিনি দ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকটী এইবার রাগিয়া বলিলেন "তোমার কি হয়েছে, তুমি নেশা করেছ না কি!" তাঁহার এইকথা রামবাবুর কোপাগ্নিতে ঘৃতস্বরূপ হইল, তিনি তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিলেন এবং দ্বার ভাঙ্গিবার অভিলাষে বেগে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ও দিকে কমলমণি ও বিনোদিনী রহস্য পাকিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সত্বরে প্রদীপ লইয়া আসিলেন। বিনোদিনী দূর হইতে চেঁচাইতে লাগিলেন "কি হয়েছে রামবাবু, কি হয়েছে, এমন করছেন কেন? ভয় পেয়েছেন না কি?" এই বলিয়া শিকল খুলিয়া উভয়ে প্রবেশ করিলেন। পাঠিকাকে বলিতে হইবে না যে রামবাবু যে স্ত্রীলোকটীর প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার করিলেন, তিনি তাঁহার সেই কুমুদিনী। কুমুদিনী ভগ্নী দ্বয়ের আগমনে একটু ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে ২ বলিতে লাগিলেন "যেমন অদৃষ্ট, লোক হাসানে কপালে আর কত ভাল হবে!" বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কি হয়েছে রামবাবু? দিদী কি তোমারে মারিয়াছে! দিদীর বড় অন্যায়, আহা কান দুটী রাঙ্গা হইয়াছে, গালে কালশিরা পড়িয়াছে, দিদীর বড় অন্যায়।" কমল তাহাতে যোগ দিয়া কহিলেন 'না ভাই! রাগ করো না, ছেলে মানুষ না বুঝে এক কাজ করেছে, রাগ করো না।' এই বলিয়া রামবাবুকে বিছানার উপরে বসাইলেন। রামবাবু বিনোদিনীকে দেখিয়া সকল বুঝিলেন—বুঝিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না। এই স্থলে বিনোদিনী কমলের পরিচয়

দিলেন। কমল রামবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন 'ভাই কিছু মনে করোনা।' রাম বাবু লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না।

কমল ও বিনোদিনী চলিয়া গেলে, রাম বাবুর এক কাজ বাড়িল। যাহার জ্বালা সে নহিলে কখন অপরে বুঝিতে পারে না। কুমুদিনী রাগে ফুলিতেছে, এক্ষণে তাহার রাগ কমাইতে হইবে। রামবাবু অনেক অনুনয় করিলেন, আপনাকে নির্দ্দোষী দেখাইবার জন্যে অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার রাগ কমিল না। অনেকক্ষণ পরে কুমুদিনী একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন যদি তিন রাত্রি প্রাণদণ্ড * সহিতে পার, তবেই ভাল নচেৎ নহে। সেই নির্দ্দয় দণ্ডের কথা শুনিয়া রামবাবুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অনেক কাঁদিলেন কাটিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। পরে কুমুদিনী একটু সদয় হইয়া বলিলেন 'আচ্ছা, তুমি বলিতেছ ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই, তা তোমার দণ্ডের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন না করিয়া স্থায়িত্ব কমাইয়া দেওয়া গেল। তুমি এক রাত্রি প্রাণদণ্ড সহ্য কর।' অগত্যা রাম বাবুকে তাহা সহ্য করিতে হইল। নহিলে আর কি করেন? কুমুদিনী যেমন যমের পদ পাইবার উপযুক্ত!

শশী বাবু রাত্রে আর আসিলেন না। পর দিন প্রভাতে উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইল এবং এইস্থলে আমাদের গল্পও ফুরাইল।

কানাডা দেশীয় ইন্দুর।

আমরা সামান্যতঃ যে সকল জন্তু দর্শন করি, অপার কৌশলময় জগদীশ্বর তাহারই এইরূপ এক একটী বিচিত্র ও অদ্ভুত জাতি রচনা করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নিম্নে যে ছবি অঙ্কিত হইল তাহা দেখিয়া

* তিন রাত্রি প্রাণদণ্ড! প্রাণদণ্ড ত এক মুহূর্ত্তের কথা। আমরা প্রাণদণ্ডের কথা বলিতেছি—পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ বুঝিতে না পারেন তবে বঙ্গদর্শন পত্রিকা খুঁজিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবেন।

পাঠিকাগণ অবশ্যই কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন। ইহা ইন্দুর বই আর কিছুই নহে, কিন্তু কেমন সাজ সাজিয়াছে দেখ? দুই হনুস্থানে দুইটী বৃহৎ থলী,
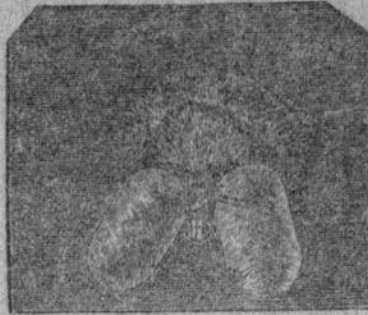
জন্তটী যেন জুজু সাজিয়া ভয় দেখাইতেছে। এই জাতীয় ইন্দুর উত্তর আমেরিকার কানাডা নামক প্রদেশে দৃষ্ট হয়। ইহার শরীর পাংশু বর্ণ, গাত্রের উপরিভাগের বর্ণ অপেক্ষা অধোদেশের বর্ণ ফাঁকাশে। ইহার শরীর প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ; লাঙ্গুল অল্প অল্প লোমাবৃত ও লম্বে দুই বুরুল; পা ক্ষুদ্র, সম্মুখের পা অত্যন্ত শক্ত, তাহাতে পাঁচটী করিয়া নখর আছে, তদ্দ্বারা ভূমি খনন কার্য্য অতি সুন্দররূপে চলিতে পারে। পঞ্চ নখের মধ্যে, মধ্য ভাগের তিনটী বৃহৎ, অপর দুইটী ক্ষুদ্র, তাহার নিম্নে থাবা আছে। পশ্চাৎ পদের নখ সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহারও মধ্যনখ তিনটী বৃহদাকার, ভিতর দিকের নখটী ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য। ইহার দন্ত গুলি যার পর নাই তীক্ষ্ণ, বিশেষতঃ নীচের পাটী বড় ধারাল এবং উপর পাটী অপেক্ষা দীর্ঘাকার। ইহার কর্ণ দুইটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এক জাতীয় কানাডা ইন্দুরের মস্তক ও শরীর ছয় বুরুল মাত্র দীর্ঘ এবং লাঙ্গুল প্রায় তিন বুরুল দীর্ঘ দেখা যায়। ইহার গণ্ড স্থলের থলিয়া বৃহদাকার। এই থলিয়া আকার ও পরিমাণে বিবিদিগের হাতের দস্তানার ন্যায় এবং মস্তকের দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া আছে। এই জাতীয় একটী ইন্দুরী ডগ্‌লস নামক এক সাহেব কলম্বিয়া নদীর মুখের নিকট একটী বাগানে তিনটী শাবকের সহিত ধৃত করিয়াছিলেন। এই ইন্দুরী যখন ডাক্তার রিচার্ডসনের হস্তগত হয়, তখন ইহার অধিকাংশ লোম ঝরিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আর আর বিষয়ে ইহা ঠিক যেমন তেমনি ছিল। উক্ত ডাক্তার ইহার অস্থির সংযোজন প্রণালী দেখিয়া ইহাকে বৃদ্ধ জন্তু বলিয়া স্থির করেন। ডগলস সাহেব, ডাক্তার

রিচার্ডসন্‌কে এই অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে অনেক বিবরণ বলেন। তিনি বলেন এই জন্তু যখন জীবিত ছিল, তখনও ইহার হনুস্থ থলিয়া স্পর্শ করিলে অত্যন্ত শীতল অনুভূত হইত। থলিয়ার ভিতর দিক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ। মুখের নিকটে এই গ্রন্থি সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দৃষ্ট হয়। থলিয়া দ্বয় যখন পূর্ণ থাকিত, তখন আবক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইত এবং যখন খালি থাকিত, তখন সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক আকারের তিন ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইত। এই জন্তু যখন তাহার থলি খালি করিত, তখন কাঠবিড়ালের ন্যায় হাঁটু গাড়িয়া বসিত, এবং দাড়ি ও সম্মুখের থাবা দিয়া থলি বুকের উপর চাপিত।

ডাক্তার রিচার্ডসন বলেন এই সকল ক্ষুদ্র জাতীয় ইন্দুর ফোর্ট ভাঙ্কো-ভারের নিকটে অধিক সংখ্যক দৃষ্ট হয়। ইহারা সেখানে নিম্ন পাহাড়ের অধিত্যকায় বাস করে এবং বালুকাময় ভূমিতে গর্ত্ত খোঁড়ে, এই জন্য ইহাদিগকে বালুকা-ভক্ত ইন্দুর বলিয়া থাকে। ইহারা ওক বৃক্ষের ফল, সুপারি এবং ঘাস খাইয়া থাকে এবং ফোর্টের পার্শ্বস্থ আলু ক্ষেত্রে যার পর নাই উৎপাত করিয়া থাকে। ইহারা কেবল ক্ষেত্রে বসিয়া আলু ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। গণ্ডস্থ থলিপূর্ণ করিয়া তাহা বাসগৃহে লইয়া যায়। ইহা-দিগকে অস্মদ্দেশের ফলার-প্রিয় বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিলেও বলা যায়। প্রথমতঃ যখন ইহারা পূর্ণ বেগে দৌড়ায়, তখন যেন দুই পদে লাফাইয়া চলিতেছে বোধ হয়; এই জন্য কোন কোন প্রাণিবিদ্যাবিদ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইহারা দ্বিপদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা এত দ্রুতবেগে ধাবমান হয় যে ইহাদিগকে ধৃত করা সুকঠিন। ইহারা প্রত্যেক লম্ফ প্রদানের সময়ে পশ্চাৎ পদের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হয়। লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের ভার সাম্য রক্ষা করে। তৎকালে বাহুদ্বয় বক্ষঃ দেশে এরূপ চাপিয়া থাকে যে প্রায় তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। লম্ফ প্রদান করিয়া ইহারা সম্মুখের পদে ভর দিয়া পড়ে এবং পুনরায় শরীর খাড়া করিয়া তুলে। কিন্তু এই কার্য্য এত সত্বর সম্পন্ন করে যে তাহাতে দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রম উপস্থিত হয়। বোধ হয় যেন ইহারা মনুষ্যের ন্যায় অবিশ্রান্ত খাড়া হইয়াই চলিতেছে।

দেশাচার।

যিনি একবার মনুষ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে ইহা তিনটী দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছে। এই তিন বন্ধনই অতি কঠিন, তবে সময় বিশেষে ও ব্যক্তি বিশেষে ইহাদের কাঠিন্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাদের নাম—ধর্ম্ম ভয়, রাজশাসন ও দেশাচার। প্রথম দুইটীর বিষয়ে আপাততঃ আমরা কিছু বলিব না; শেষোক্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মভয় ও রাজশাসন অপেক্ষা দেশাচারের প্রাধান্য বিস্তর অধিক। অবশ্য এমন ২।৪ জন লোক আছেন যাঁহাদের মন, অন্য কোন শাসন মানুক বা না মানুক, একমাত্র ধর্ম্মভয়েই শাসিত। কিন্তু আমরা ২।৪ জন মনুষ্যের কথা বলিতেছি না; জন সাধারণের কথা বলিতেছি। আবার রাজশাসনও দেশাচারের ন্যায় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম নহে। ইহার মর্ম্ম একটু ভাবিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। রাজশাসনকে লোকে পদে পদে তুচ্ছ করিতে কুণ্ঠিত নহে, কিন্তু দেশাচারের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে কয়জনে সাহসী? মূর্খ লোকে ইহাকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া চলে, বিদ্বান্‌ও ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াও সমাজের অনুরোধে ইহাকে ছাড়িতে পারেন না। অতএব ইহা এক প্রকার স্থির হইল যে সমাজ যে তিন বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছে, তন্মধ্যে দেশাচারের বন্ধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে দেখা যাউক ইহার এত প্রভুত্বের কারণ কি?

যাহাকে অনেক দিন দেখিতেছি, অনেক দিন ধরিয়া যাহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া আসিতেছি, স্বভাবতঃ তার প্রতি আমাদের অনুরক্তি জন্মে। এটা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। শুদ্ধ মনুষ্যের কেন, জন্তু মাত্রেরই মধ্যে ইহা কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ আমরা চিরকাল যাহা করিয়া আসিতেছি, তাহা শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারি না। ভাল হউক, মন্দ হউক,—চিরকাল যাহা করিতেছি তাহাই করিতে হইবে, তাহার অন্যথা করিলে চলিবে না। অন্যথা করিলে পরে কি ফলাফল ঘটিবে, তাহাও ভাবিয়া দেখি না। বস্তুতঃ অন্যথা করিবার কথা ভাবিতে মনে কখনই প্রবৃত্তি জন্মে না। দেশাচারের প্রভুত্বের ইহা প্রথম কারণ বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় কারণ আত্মাভিমান। আমাদের মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার

প্রচলিত আছে সে সকলই অতি উৎকৃষ্ট, তাহাদের মধ্যে কোন দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই, এই বিশ্বাসটী আমাদের মনে অতি দৃঢ়। কিন্তু যদি কখন ভাবিয়া দেখিতে যাই যে এই সকল আচার ব্যবহার যথার্থতঃ ভাল কি মন্দ, তাহা হইলে আত্মাভিমান তৎক্ষণাৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ভাল মন্দ বিচারে সক্ষম হইতে পারি না। শেষে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া উঠে যে আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সকলই উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট কিছু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মাভিমানকে দেশাচারের প্রভুত্বের একটী কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে।

পুনশ্চ মনুষ্যদিগের মধ্যে কিছু সকলেই সমান বিজ্ঞ নহে। কেহ বা পণ্ডিত চূড়ামণি, কেহবা নিতান্ত জড়বুদ্ধি, সুতরাং ভাল মন্দ বিচারে সকলে সমান সক্ষম নহে। এই জন্য সমাজ মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত অথবা সদ্‌গুণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, জনসাধারণ সকল বিষয়ে তাঁহাদেরই অনুসরণ করে। ইহা দেশাচারের প্রভুত্বের আর একটী কারণ। শাস্ত্রকারেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এবং মহা মহা পণ্ডিতে যাহা অনুমোদন করিয়া আসিতেছেন তাহাতে যে কোন দোষ থাকিতে পারে ইহা আমরা শীঘ্র বিশ্বাস করিতে চাহি না। অধিক কি, অনেক সময়ে এরূপ চিন্তাকে পাপ চিন্তা বলিয়া যত শীঘ্র পারি মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করি! সুতরাং সমাজ মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, ভাল হউক মন্দ হউক, তাহারা দিন দিন বদ্ধমূল হইতে থাকে।

সমাজচ্যুতি ভয় দেশাচারের প্রাধান্যের আর একটী কারণ। কোন আচার লঙ্ঘন করিতে চাহ কর, কিন্তু সমাজ তোমাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবে। এই সামাজিক শাস্তি কিরূপ ভয়ানক তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সমাজচ্যুত হইয়া মনুষ্য সমাজে বাস করা আর অরণ্যে বাস করায় বিশেষ প্রভেদ নাই। সুতরাং দেশাচারের এত যে প্রভুত্ব হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু পাঠকবর্গকে সাবধান করিবার জন্য এই স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা সমাজচ্যুতিরূপ সামাজিক শাস্তির কথা বলিয়াছি। আপাততঃ এরূপ বোধ হইতে পারে যে ইহাই দেশাচারের প্রভুত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে যে এই সিদ্ধান্ত

নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পূর্ব্বোল্লিখিত কারণত্রয়ের প্রভাবে দেশাচারের প্রভুত্ব যত বাড়িয়াছে, সমাজচ্যুতিরূপ শাস্তির প্রভাব কখনই তত নহে। কারণ, কোন বিশেষ দেশাচার লঙ্ঘন করা উচিত কি না এই কথা প্রথমোক্ত কারণ ত্রয় বশতঃ আমাদের মনের ভিতরে আদৌ প্রবেশ করিতেই পায় না। আর আমাদের মনে এইরূপ কোন ভাবের আবির্ভাব হইলে সমাজচ্যুতি ভয় তখন তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা পায় মাত্র। আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে, 'কোন দেশাচার লঙ্ঘন করা বিধেয়' এইটী লোকের একবার হৃদয়ঙ্গম হইলে সমাজচ্যুতি ভয় আর অধিক দিন বাধা দিতে পারে না। দুই দিনে হউক আর দশ দিনে হউক নিশ্চয়ই তাহার পতন হয়। অতএব এরূপ বুঝিতে হইবে না যে সমাজচ্যুতি ভয় দেশাচারের প্রাধান্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ।

কারণ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহার অধিক আর এক্ষণে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য আমরা যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি তদ্ব্যতীত অন্য কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু দেশাচারের প্রভুত্বের সমস্ত কারণ গুলি নির্দ্দেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিরূপে ইহা সমাজ মধ্যে এত বদ্ধমূল হইল পাঠকবর্গকে ইহা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ বিষয় সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া এক্ষণে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিব।

আমরা দেশাচারের প্রাধান্যের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে দেখা যাউক এতদ্দ্বারা সমাজে কিরূপ ফলাফল উৎপন্ন হয়। প্রথমে বিবেচনা করা উচিত যে সমাজে ইহার কোন আবশ্যকতা আছে কি না? একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ইহা ব্যতীত সমাজ কখনই সুশৃঙ্খলে চলিবে না। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা ধর্ম্মশাসন অথবা রাজশাসন মতে গর্হিত নহে, অথচ সে সকল প্রথা প্রচলিত থাকিলে সমাজের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ প্রথার একমাত্র দমন দেশাচার। ধর্ম্মশাসন বা রাজশাসন তাহাদের প্রতিবন্ধক হইবে না, সুতরাং দেশাচার যদি তাহাদিগকে দমন না করিত, তাহা হইলে সমাজে তাহারা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইত, এবং দিন দিন সমাজের দুঃখরাশি পরিবর্দ্ধিত করিত। অবশ্য একথা স্বীকার করি যে দেশাচার হইতে অনেক বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা দেশাচারের দোষ দিতে প্রস্তুত নহি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবেচনা কর—আমার সম্মুখে অগ্নি রহিয়াছে,

আগুন দেখিয়া হউক আর না দেখিয়া হউক, সেই অগ্নিতে অঙ্গুলি দিলাম। ইহার ফলস্বরূপ আমার অঙ্গুলি দগ্ধ হইল। এ দোষ কাহার?—আমার না অগ্নির? যদি অগ্নির না হইল, তাহাহইলে দেশাচার হইতে যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহাদের জন্যে দেশাচার কখনই অপরাধী হইতে পারে না। আমার হাত পুড়িয়া গেল বলিয়া যেমন আমি বলিতে পারি না যে অগ্নির দাহন শক্তি অতি মন্দ, ইহা না থাকিলেই ভাল, সেইরূপ দেশাচার হইতে কতকগুলি কুফল জন্মিতেছে বলিয়া আমি ন্যায়তঃ একথা বলিতে পারি না যে দেশাচারের শাসন সমাজের অমঙ্গলকর, ইহা না থাকিলেই আমাদের মঙ্গল। অগ্নির দাহন শক্তির যথার্থ ব্যবহার জান না বলিয়াই তোমার ঘর পুড়িয়া যায়। আর, তুমি যদি ইহার যথার্থ ব্যবহার অবগত থাক, তাহা হইলে ইহা হইতে বিশুদ্ধ মঙ্গল উৎপন্ন হইবে।

আমরা দেশাচারের ফলাফলের কথা বলিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক এই সকল ফলাফল কি কি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। আমরা নিম্ন-লিখিত চারিটী বিভাগ স্থির করিযাছি। এই চারিটী বিভাগ অনায়াসে বোধ-গম্য হইবে।

প্রথমতঃ—কতকগুলি বিশুদ্ধ মঙ্গলপ্রদ। দ্বিতীয়তঃ—এমন কতকগুলি আছে যাহাহইতে মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ—কতক গুলি হইতে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বিবিধ ফল উৎপন্ন হয়। চতুর্থতঃ—কতকগুলি হইতে শুদ্ধ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, তাহাতে মঙ্গলের লেশ মাত্র নাই।

এক্ষণে দেখা উচিত দেশাচার সম্বন্ধে লোকের কি কর্ত্তব্য। যখন আমরা জানি যে সমাজ মধ্যে এমন অনেক প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, যাহাতে দিন দিন সমাজের অবনতি হইতেছে—সুতরাং আপনাদের সর্ব্বনাশ আপনারা করিতেছি, তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কখনই বিধেয় নহে। সমাজের উন্নতি (অর্থাৎ আপনাদের উন্নতি) জন্য দুইটী কথা বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। সেই দুইটী কথা কি, পরে বলিতেছি। আমরা আত্মাভিমানের দোষ দিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে আত্মাভিমানমাত্রই দূষ্য। আমরা পূর্ব্বে যে আত্মাভিমানের নিন্দা করিয়াছি তাহা অতিরিক্ত আত্মাভিমান,—শুদ্ধ তাহাই দূষ্য।

কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যে সমাজে আত্মাভিমানের লেশ মাত্র নাই সে সমাজও কখন প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। যাঁহারা ভাল মন্দ না ভাবিয়া আপনাদের চিরন্তন প্রথা সকল কথায় কথায় পরিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত, আর যাঁহারা আত্মাভিমানবশবর্ত্তী হইয়া অতি জঘন্য প্রাচীন আচার সমূহ সমাজে প্রচলিত রাখিতে ব্যস্ত, তাঁহারা উভয়েই সমান দোষভাজন,—উভয়েই সমাজের শত্রু, উভয়েরই কথায় সাবধানে কর্ণপাত করিতে হইবে। আমরা যে দুইটী কথা বলিব বলিয়াছিলাম তাহা কি, বোধ হয় এক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিয়াছেন। সে দুইটী কথা এই,—আপনাদের যাহা কিছু ভাল আছে প্রাণান্তে সে সব পরিত্যাগ করিও না, পূর্ব্বপিতৃগণ প্রদত্ত ধন ভাবিয়া সে সকল সাবধানে রক্ষা কর। আর আপনাদের মধ্যে যাহা কিছু অমঙ্গল আছে, যত শীঘ্র পার সমাজ হইতে সে সকল কণ্টক উন্মূলিত করিয়া ফেল। সামাজিক উন্নতির এই এক মাত্র উপায়। যাঁহারা এই দুইটী কথা বুঝিবেন না, তাঁহাদের কস্মিন্‌-কালে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের এ প্রস্তাব শেষ হইয়া আসিল। এই স্থলে বামাবোধিনীর পাঠিকাগণকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে এই এই দেশাচার গুলি অতি নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর, অতএব পাঠিকাবর্গ আপনারা ত্বরায় তাহাদিগকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিন। এইমাত্র বক্তব্য যে যখন দেশাচারের উপরে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তখন সকলের বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে আমাদের মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের দ্বারা সমাজের কোন অমঙ্গল হইতেছে কি না। কিন্তু এই বিষয় ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বে মনকে কুসংস্কার বিবর্জ্জিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নচেৎ ভাবিয়া দেখায় আর না দেখায় সমান ফল উৎপন্ন হইবে। মনের যে যে অবস্থাকে আমরা পূর্ব্বে দেশাচারের প্রভুত্বের কারণ বলিয়াছি সেই গুলিকে মন হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে কেহ কখনই এ বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইবেন না। পুনশ্চ, যাঁহারা আমাদের কথায় মনোযোগ দিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের সাবধানার্থ ইহা বলিতে চাহি যে শাস্ত্রকারেরা যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন সে সমস্তই যে বেদবাক্য বলিয়া মানিতে হইবে এমন কিছু নহে।

শাস্ত্রের এমন অনেক কথা আছে যাহাদের এক্ষণে ব্যবহার নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ শুদ্ধ এই যে সেই সেই আচার শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা অনুমোদিত হইলেও জনসাধারণের (অর্থাৎ সমাজের) অসুবিধাজনক বলিয়া এক্ষণে প্রচলিত নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রকারদের কথা সকল সময়ে মাননীয় হইতে পারে না। এই স্থলে আর একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বোধ হয় পাঠিকাবর্গ অবগত আছেন সময়ের স্রোতের ন্যায় সমাজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির নহে; ভাল মন্দ যে দিকে হউক এক দিকে অবশ্যই ধাবিত হইবে। সুতরাং বহুকাল পূর্ব্বে সমাজের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে কখনই সেরূপ নহে। এ কথা স্বীকার করিতে বোধ হয় সকলেই প্রস্তুত। কিন্তু ইহা যদি স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে একথাও স্বীকার করিতে হইতেছে যে বহুকাল পূর্ব্বে যখন সমাজের অবস্থা এখনকার মত ছিল না, তখন শাস্ত্রকারেরা যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন সে সকল কথা কখনই এক্ষণে পদে পদে প্রতিপালন করিতে পারা যায় না। তাঁহারা সমাজের আধুনিক অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাদের সকল ব্যবস্থা এক্ষণে কিরূপে প্রতিপালন করিব? আর এরূপ বিশ্বাসও নিতান্ত অন্যায় যে শাস্ত্রকারেরা জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া তাঁহারা সকল বিষয়েই অভ্রান্ত। এ কথাটী সকল সময়ে মনে রাখা উচিত যে মনুষ্য মাত্রেই ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী।

আমাদের এই প্রস্তাব শেষ করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিতে বলিয়া গিয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। দেশাচারের প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য লোকে অনেক উপায় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দেশাচারের সহিত ধর্ম্মকে জড়াইয়া তাঁহাদের মনস্কামনা যেমন সিদ্ধ হইয়াছে তেমন আর কিছুতে হয় নাই। শাস্ত্রকার আদেশ করিলেন যে কন্যার পিতা বালিকা বয়সে কন্যার বিবাহ দিবেন। এটী সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র, সুতরাং পাছে লোকে ইহা লঙ্ঘন করে, এই ভয়ে শাস্ত্রকার পুনরায় শিক্ষা দিলেন যে এই আদেশ যিনি পালন না করিবেন তাঁহার পিতৃপুরুষগণ নরকে পচিয়া মরিবেন। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা সামাজিক নিয়ম ছিল, এক্ষণে ধর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া তাহার বল দশ গুণ বাড়িল। বাল্য বিবাহ ভাল কি

মন্দ তাহা আমরা এস্থলে বিচার করিতেছি না। ধর্ম্মের সহিত দেশাচার জড়িত হইলে শেষোক্তের কতদূর বল বৃদ্ধি হয় ইহা দেখাইবার জন্য আমরা উক্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছি। এক্ষণে পাঠকবর্গকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে যেখানে ধর্ম্মের সহিত দেশাচার জড়িত রহিয়াছে সেইখানে একটু স্থির হইয়া ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা পাইবেন। অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

পাঠক! এই বার এই প্রবন্ধের শেষ হইল; এক্ষণে একটু ভাবিয়া দেখুন। আপনি মনুষ্য, সুতরাং আপনার নিজেরও অন্য সাধারণের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বৃদ্ধি করা আপনার প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধের অন্য স্থলে বলিয়াছি, এবং এখানেও বলিতেছি যে দেশাচারের উপরে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব আমাদের মধ্যে যে সকল দূষ্য আচার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে, তন্নিবারণে যদি যথাসাধ্য চেষ্টা না করেন তাহা হইলে আপনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিলেন না, সুতরাং ঈশ্বরের বিচারে তজ্জন্য দায়ী রহিলেন।

কুকুরের প্রভুভক্তি।

কুকুরদিগের প্রভুভক্তির অনেকানেক দৃষ্টান্ত আমাদিগের পাঠিকাগণকে অবগত করিয়াছি, অদ্য আর একটী আশ্চর্য্য অথচ শোচনীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

একজন ফরাসী বণিকের কোন স্থানে কিছু টাকা পাওনা থাকাতে তিনি আপনার কুকুরটীকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে তথায় গমন করিলেন। পরে টাকাকড়ি একটী ব্যাগে পুরিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বণিক কয়েক ক্রোশ গিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিলেন এবং ব্যাগটী পার্শ্বদেশে রাখিয়া একটী তরুচ্ছায়াতে উপবেশন করিলেন। অশ্বে পুনরারোহণ করিবার সময় ব্যাগটী লইতে বিস্মৃত হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়াছেন, সমভিব্যাহারী কুকুর তাঁহার নিকটে ব্যাগ নাই

দেখিয়া তাহা আনিবার জন্য দ্রুতবেগে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু অধিক ভারী বলিয়া টানিয়া আনিতে পারিল না।

কুকুর তখন দৌড়িয়া তাহার প্রভুর নিকট আসিল এবং বিকট চিৎকার করিয়া তাঁহার ভুল হইয়াছে জানাইতে লাগিল। বণিক্ কুকুরের এরূপ করিবার কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না। কুকুর তাঁহাকে থামাইবার চেষ্টায় আরো ভয়ঙ্কর নাদ করিতে লাগিল এবং অশ্ব কিছুতেই থামে না দেখিয়া তাহার পায় কামড়াইতে আরম্ভ করিল।

বণিক্ তখন মনে করিল কুকুর ক্ষেপিয়াছে। একটী নদী পার হইবার সময় সে জল পান করে কি না দেখিবার জন্য অশ্বকে দ্রুততর বেগে চালাইয়া দিলেন। কুকুর প্রভুর হিতচিন্তায় এতদূর অভিভূত ছিল যে নদীর নিকটে আসিয়াও জলপান করিবার জন্য থামিল না, বরং অধিক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অশ্বকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল।

বণিকের মনে তখন স্থিরপ্রত্যয় হইল, কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তিনি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহাকে গুলি করিলেন। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে কুকুরের সর্ব্বশরীর রক্তেতে ভাসিয়া গেল। প্রভু তাহার অবস্থা দর্শনে অসমর্থ হইয়া বেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন।

বণিক্ আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি অতি হতভাগ্য, কুকুর না গিয়া আমার টাকা গেলেও ক্ষতি ছিল না। তখন টাকা কোথায় দেখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু ব্যাগ দেখিতে পাইলেন না। তৎক্ষণাৎ আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন এবং কুকুর তাঁহার চৈতন্যোদয়ের জন্য যে সঙ্কেত করিয়াছিল তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

বণিক্ তখন ঘোড়াকে ফিরাইলেন এবং পথিমধ্যে যেস্থানে থামিয়াছিলেন তথায় ফিরিয়া চলিলেন। যতদূর যান পথময় রক্তের দাগ দেখিতে দেখিতে চলিলেন, কিন্তু কুকুরকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে বিশ্রাম তরুতলে গিয়া দেখিলেন, টাকার ব্যাগ তথায় রহিয়াছে এবং কুকুর মৃত্যু-যাতনায় বিকল হইয়াও প্রাণপণে ব্যাগটী রক্ষা করিতেছে।

কুকুর যখন প্রভুকে দেখিল, তখন অল্প অল্প লেজ নাড়িয়া আহ্লাদ প্রকাশ

করিতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়াতে পারিল না। তখন তাহার প্রভু গভীর শোকার্ত্ত হইয়া যে হস্ত দিয়া তাহার আদর করিতেছিলেন, সে সেই হস্ত জিহ্বা দিয়া চাটিতে লাগিল এবং চাটিতে চাটিতে কালনিদ্রায় নয়ন মুদ্রিত করিল।

ভারত ললনা।

(১)

দুঃখিনী মাতার কন্যে,
চিরদুঃখিনী ললনা,
ভারতবাসিনী অয়ি,
চির অশ্রুল নয়না,
চির আঁধার মগনা,
ভাবিলে বিজনে,
বসি এক মনে,
তোদের যাতনা।
বুক ফাটি যায়
পরাণে সহেনা॥

(২)

শোক পারাবার,
মানসে উথলে,
প্রবল ঝটিকা, গর্জিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গ ছুটিয়া, দুকুল ভাসায়,
দেখিলে নয়নে,
তোদের যাতনা।
আকাশ প্রমাণ, হৃদয়ে ধরেনা,
সে তরঙ্গ ঘাতে অচল টেঁকেনা।

কিন্তু
ভারত পুরুষ, সুকঠিন হিয়া,
দিয়াছেন বিধি, কিদিয়া গড়িয়া,
দেখে দিবানিশি,
তবুও ফাটেনা,
দুটী চোক্ ভরি,
তোদের যাতনা।
ঘোর দুঃখ নিশি চিরদিন প্রাসি,
থাকিবে কি হায়! তোদের কপাল?
একটী তারকা, রবি কিবা শশী,
তোদের আকাশে উঠিবেনা আর?
একটী কিরণ, ধানি আপনার,
নাশিবেনা এই ঘোর তমোজাল?
না—না—না—।
খুলিছিলা যবে, বর অঙ্গ ভূষণ,
অকুণ্ঠিতচিতে, সমর কারণ,
তথাপি যখন,
দুষ্ট রাহু হেন,
দুরন্ত যবন,
গ্রাসিল আসিয়া,

ভারত তপন।
সেই দিন বিধি, আপনি তাপিয়া,
গগণের বক্ষে, রাখিলা লিখিয়া,
"না—না—না।"
ভারত ললনা!
তব সুখ আর,
জগতে হবে না।
হিন্দু আর্ত্তনাদ, ম্লেচ্ছ জয়ধ্বনি,
যুগপৎ যেন, বলিল এ বাণী
"না—না—না—।
ভারত ললনা!
তব সুখ আর,
জগতে হবে না।
অমনিই যেন গর্জ্জিয়া সকল,
ভারতের বক্ষে কানন অচল,
সমুচ্চে বলিল;
না—না—না।
ভারত ললনা!
তব সুখ আর,
জগতে হবে না।"
তনয়ার দুঃখে, ভূভারত যেন,
কান্দিয়া উঠিল;
না—না—না।
ভারত ললনা!
তব সুখ আর,
জগতে হবে না।"
সিন্ধু পারান্তরে, দেশ দেশান্তরে,
একথা রটিল;
"জনম দুঃখিনী আহা!
ভারত ললনা।"

(৩)

কেনরে বুঝিনা, বিধি বিড়ম্বনা!
কেন যে জনমে, এখনও হায়রে!
দিন শত শত, ভারতে ললনা!
আহাগো ভগিনি! আহাগো ভগিনি।
জনম তোদের,
মিছা বিড়ম্বনা;
তোমরা কি তাহা বুঝনা জাননা?

(৪)

তবে কেন বৃথা, এ নিদয় দেশে,
জনম লভিয়া, অমরীর বেশে,
ক্রীতদাসী প্রায়, অশেষ কেলেশে,
কাটাও জীবন, কান্দি অবশেষে।
ধর পাখা লও, বিহগিনী হও;
অনন্ত আকাশে, উড়ি চলি যাও।
ভারতের বক্ষ, ছাড়িয়া পলাও!

(৫)

তোরা গৃহলক্ষ্মী,
ছাড়ি চলি গেলে,
যাইবে ভারত, সদ্য রসাতলে।
হবে উল্কাপাত,
মহা বজ্রাঘাত,
ঘোর ভূকম্পন,
অগ্নি বরিষণ,
হইবেক মহা, প্রলয় ঘটন;

হাতে হাতে ফল পাইবে তখন,
ভারতে নির্দ্দয়, পুরুষেরগণ !

(৬)

মানব সংসার, কুসুমের তরু,
তোরা লো সকলে, ললিত প্রসূন,
হৃদয়েতে মধু, নানাবিধ গুণ।
আছে কি ললনা, এজগত মাঝে,
গুণে গরীয়সী, তোমাদের কাছে ?
কোন্ নারী পারে, মৃতপতি পাশে,
জীবন অর্পিতে, জ্বলন্ত হুতাশে,
অকাতর মনে হাসিতে হাসিতে,
সতীর মহিমা, বিকাশি মহীতে ?
কটী দেবী আছে,
এমন জগতে ?
"অচল বিমল, বিদ্যুতের আভা,
দেখিতে দেখিতে, হয় হীনবিভা।"
কটী যে ঘটেছে, এরূপ ঘটনা,
সমস্ত জগতে, ভূভারত বিনা,
শুনি নাই কোথা, জানে না কল্পনা ॥

(৭]

তথাপি ভারত, কেন যে বোঝেনা !
ভারত পুরুষ, ভাবিয়া দেখনা !
দরিদ্র কুটীরে, এমন প্রতিমা !
নানাগুণ ছবি, কুলের গরিমা।
দেশান্তরে যাহা, রাজার ঘটে না।
রাজপুরী অন্ধ, যে দীপিকা বিনা।
মণিমুক্তা বিভা, পায় কি আদর,
সতীর প্রভায়, যথা নিশাভোর ?

[৮]

দময়ন্তী সীতা, সাবিত্রী সতন,
ভারতের বাছা, তিনটী রতন,
যার ঘরে হয়, একত্র মিলন।
জগত রাজত্ব, সেও কি কখন,
মনে মনে ভাবে, সুখের কারণ ?
এখনো মিলিবে, ভারতে খুঁজিলে
গুপ্ত খনি বহু, পূর্ণ মণি জালে !

[৯]

কোন্ দেশে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী,
বিশ্ব হিততরে, তরল তরঙ্গে,
শঙ্খনাদকারী, ভকতের সঙ্গে,
ব্রহ্মলোক ত্যজি, সাগরগামিনী।
কোন্ দেশে আছে, ভারতযোগিনী,
জগতের হিতে, সংসারত্যাগিনী !

[১০]

পৃথিবী যদ্যপি বায়ুতে মিশায়,
নামটী যদিও কালেতে লুকায় ;
তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের গুণ,
কদাপি যাবেনা, জগত ছাড়িয়া।
অনন্ত আকাশে, বেড়াবে উড়িয়া,
কখনো যাবেনা, বিলীন হইয়া।

[১১]

মানব থাকিতে, জগৎ থাকিতে,
ভাস্কর উদিতে, পবন বহিতে,
কার না হৃদয়ে, থাকিবে অঙ্কিত,
যবনের ভয়ে, হইয়া শঙ্কিত,
জলন্ত চিতায়, দিলেন আহুতি,

জীবন্ত শরীর, রাজপুত সতী!
পুগল তিলক, যুবরাজরাণী,
করম দেবীর, ছিন্ন কর খানি,
অকাতরে যাহা, কাটিলেন সতী,
অরিকরে যবে হত প্রাণপতি।
ভারতনারীর দিইতে তুলনা;
এজগতে আছে, কয়টী জানি না!

[১২]

বহুদূর নয়, কিছু দিন হয়,
ঘটিয়াছে যাহা, ঘটিবেনা তাহা,
ঘটে নাই আর, সংসার মাঝার,
ভূভারতে, বিনা ভারত ললনা,
কোথায় কে কবে, ঘোর শিঙ্গারবে,
কাঁপায়ে মেদিনী, সমর রঙ্গিণী?
সমর অঙ্গনে, অশ্ব আরোহণে,
করে তরবারি, ছদ্মবেশধারী।
নয়ন মুদিয়া, হৃদয় খুলিয়া,
দেখ একবার, হবে চমৎকার!
সত্য যুগ গাথা, হবে সত্য কথা।
"আলুথালু কেশ, মহাঘোর বেশ,
লোলিত রসনা, অনলনয়না,
মুখে অট্টহাস,
জগত বিনাশ!
ঘোর হুহুঙ্কার, মার মার মার,
করেছে সংহার, অসুর অপার,
সমর সাগরে, ভাসিছে অডরে,
বামা একাকিনী, ভবেশমোহিনী!
মানসী অধীশ্বরী,
কর্ণহীনা তরি,
প্রতিকূল ঝড়ে, সমর সাগরে,
তথাপি যাইছে,
কেমন সজোরে, কেমন অডরে,
দেখরে চাহিয়া তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া!!
ঐদেখ অরি,
যারা গর্ব্ব করি,
এখনও বলে, কেহ নহে বলে,
সংসার মাঝারে,
তাদের সমান।
অই দেখ নারী, কাঁচের প্রমাণ,
সব গর্ব্ব হেলে,করি খান খান,
বীরকার্য্য সাধি,
বীর নারী মত, ত্যজিল পরাণ!!
কোথা আছে বল ভারত সমান,
নারী কুলে দিতে, এমন প্রমাণ?

[১৩]

কিন্তু
আমার নিবন্ধা, হরিণীর প্রায়,
এদের দুর্দ্দশা দেখি প্রাণ যায়,
পিঞ্জরে বিহঙ্গী, করে যদি গান।
কয়জন শুনে, পাতি তাহা কাণ?
আপনিই গায়, আপনিই শুনে,
আপনিই কোলে,আপনার গুণে।
কান্না পেলে কান্দে, পরাণ ভরিয়া,
হাসি পেলে হাসে, হৃদয় খুলিয়া
কিন্তু
সবি যায় হায়, শূন্যেতে মিশিয়া।
কান্দিলেও কেহ, করেনা বারণ।

হাসিলেও কেহ পুছেনা কারণ।
জগত যখন, হরিষে বিহরে,
তখন তাদের, ছুটী আঁখি ঝরে।
জগত যখন,
বিষাদে উন্মাদ,
তখন তাহারা, নিদ্রায় বিচেত!
জগতের সুখে, নহে তারা সুখী।
জগতের দুঃখে, নহে তারা দুঃখী।
পিঞ্জরের পাখী, পিঞ্জরেই খায়,
পিঞ্জরেই থাকে, পিঞ্জরে শুকায়।
জগতের তারা, নাহি ধারে ধার,
সংসারে তাদের সতত আন্ধার।

[১৪]

আহাগো ভগিনি! ভারত ললনা!
কতকাল আর, সহিবে যাতনা?
ভারত পুরুষ, কতকাল আর,
মেলিয়ে নয়ন, ঘুচাবে আন্ধার?
করিবে তোদের, উদ্ধার সাধন?
এক হয়ে করে, ভারতীয়গণ,
তোমাদের দুঃখে কান্দিতে শিখিবে?
তোমাদের সুখে, আহ্লাদে নাচিবে?
কবে যে তাদের মুখ আর মন,
তোমাদের তরে, করিবে মিলন।
কল্পনা ও তাহা, দেখেনা এখন॥
নিজে না মেলিলে, টানিয়া নয়ন,
যাবেনা আন্ধার,
চিরদিন রবে, এখনো যেমন।
চিরদিন দুঃখে, হইবে যাপন।
তোমাদের নিদ্রা, ভাঙ্গে কে এখন?
ভারত নিদ্রায় আপনি মগন!!!

জলের চক্রাবর্ত্ত গতি।

আমাদিগের শরীরে রক্ত যে চক্রাবর্ত্ত গতিতে ঘুরিয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিতেছে, তাহা পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন। এখন জলের এক প্রকার চক্রাবর্ত্ত গতি আছে, তাহাই তাঁহাদিগকে অবগত করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। একটা সামান্য প্রবাদ আছে; সমুদ্রের জল কখন কমে না, বাড়ে না, যেমন তেমনি থাকে। ইহা অনেকটা ঠিক্। ইহার কারণ এ নয় যে সমুদ্র হইতে জল ব্যয় হয় না, কিন্তু যে পরিমাণে ব্যয় হইতেছে সেই পরিমাণে আয়ও হইয়াছে। একজন গ্রীক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি সমুদ্রের জল সেচন করিয়া ফেলিতে পারেন কি না, তাহাতে তিনি বলেন, "যদি নদী সকলের মুখ বন্ধ করিতে পার, তাহা হইলে অনায়াসে

সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সমুদ্র হইতে যে পরিমাণ জল বাষ্প হইয়া যাইতেছে, যদি নদী প্রভৃতি হইতে সেই পরিমাণ জল সমুদ্রে আসিয়া না পড়ে, তাহা হইলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। এই প্রকারে মহাসাগর সকল শুষ্ক হইয়া কালে বালুকারণ্যে পরিণত হইয়াছে।

আমরা জলের যে চক্রাবর্ত্ত গতির কথা বলিতেছি তাহা এখন বুঝা যাইতেছে। সমুদ্র হইতে জল বাষ্প হইয়া উঠিয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ বৃষ্টি হইয়া পর্ব্বতে নদীর আকার ধারণ করে, তাহাই আবার নানা দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই সমুদ্রে পুনরায় আসিয়া পতিত হয়। অতএব সমুদ্রের যে জল সেই জলই থাকে, কেবল মধ্য হইতে তাহার কতক ভাগ উঠিতেছে ও পুনরায় তাহাতে আসিয়া পড়িতেছে। জগদীশ্বর এইরূপ জল উঠিবার ও পড়িবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সৃষ্টি সংসার রক্ষা পাইতেছে এবং জলও বাষ্প, মেঘ, শিশির, কোয়াসা, শিলা, বরফ প্রভৃতি বহুরূপী হইয়া জগতের নানা কল্যাণকর কার্য্য সাধন করিতেছে।

সমুদ্র হইতে কত জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া থাকে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে পৃথিবীর নানা স্থানে যে পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হয়, তদ্দ্বারা ইহার ভাব কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। সংবৎসরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যত বৃষ্টিপাত হয়, পণ্ডিতেরা তাহা অনেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ইংলণ্ডে গড়ে ৩০ বুরুল বৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ সংবৎসরে যত বৃষ্টি পড়ে, তাহা একত্র করিয়া সমগ্র দেশের উপর বিস্তার করিলে ৩০ বুরুল বা ২॥০ ফিট মাত্র পুরু হয়। গ্রেনাডায় ১২৬ ও কলিকাতায় ৮১ বুরুল জল পতিত হয়। পর্ব্বতময় স্থলে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হয়, কোথায়ও ২০০। ২৫০ শত বুরুলও হইয়া থাকে।

পণ্ডিতেরা আরো বলেন আকাশে যত জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা যদি একেবারে গলিয়া জল হইয়া পড়িয়া যায়, তবে সমুদায় পৃথিবী ৫ বুরুল ঘন জলে আবৃত হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, এক বৃষ্টিপাতের জন্য কত পরিমাণ জল উঠিতেছে ও পড়িতেছে। তাহার পর জলকে আরো অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয় এবং অদৃশ্যভাবে সর্ব্বক্ষণ বায়ু মণ্ডলকে সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই আর না পাই, জল সর্ব্বক্ষণই উঠিতেছে

ও ঘুরিয়া ফিরিয়া নামিয়া আসিতেছে। ইহাই জলের চক্রাবর্ত্ত গতি। ইহা তিন প্রকার কারণে সংঘটিত হয়, তদনুসারে ইহা তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেঃ—১ ম, প্রাকৃতিক, ২ য় শারীর এবং ৩ য় রাসায়নিক কারণ।

১ ম, প্রাকৃতিক কারণ। প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে জলের সর্ব্বক্ষণ গতায়াত হইতেছে। জলের মেঘ হইবার কারণ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল বাষ্পাবয়ব ধারণ করে। সেই বাষ্প বায়ুর অপেক্ষা লঘু হওয়াতে উষ্ণ বায়ু প্রবাহ দ্বারা বাহিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে নীত হয়। বায়ুপ্রবাহ উচ্চতর দেশে গিয়া শীতল হয়, সেখানে বাষ্পকে মেঘ হইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় সমুদ্রে নামে এবং নূতন বাষ্প বহিয়া লইয়া উর্দ্ধদেশে উত্থিত হয় আবার নামিয়া আইসে, এইরূপ গমনাগমন ক্রমাগত করিতে থাকে। উত্থিত-বাষ্পও আকাশের উচ্চতর দেশে উঠিয়া স্থির হইয়া থাকে না। গ্রীষ্মমণ্ডলে সমুদ্র হইতে বাষ্প উর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুপৃষ্ঠে চাপিয়া উত্তর বা দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত শীত মণ্ডলের দিকে ধাবমান হয়। যেস্থানে সেই বাষ্প ঘনীভূত ও শীতল হইয়া জমিয়া যায়, সেইখানে শিলা, বৃষ্টি বা বরফের আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। সম বা হিমমণ্ডলে বৃষ্টিরূপে পতিত জল গড়াইয়া নদীতে যায়, নদীস্রোতে তত্রত্য সমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র গঙ্গা দ্বারা পুনরায় গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। পৃথিবীতে এখন যে জলরাশি আছে, সৃষ্টিকালাবধি একাল পর্য্যন্ত কতবার তাহা আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যে গমনাগমন করিয়াছে এবং জড়জগতে কত অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে?

২ য় শারীর কারণ। ইহা প্রাকৃতিক কারণের ন্যায় সুস্পষ্ট ও প্রবল নয় বটে, কিন্তু ইহাদ্বারাও জল সঞ্চালনের অল্প সহায়তা হয় না। বৃষ্টি বা শিশির যাহা ভূমিতে পড়িয়া শুষিয়া যায়, বৃক্ষ সকল শিকড় দ্বারা তাহা পান করিয়া বৃক্ষশরীরের রসরূপে পরিণত করে। বৃক্ষ সকল শুষ্ক বায়ু রাশির মধ্যে অসংখ্য পত্র বিস্তার করিয়া আছে, সেই পত্র গুলি তাহাদিগের নাসিকা যন্ত্র। তন্মধ্যস্থ অসংখ্য ছিদ্র দ্বারা বৃক্ষের রস অদৃশ্য বাষ্পরূপে সর্ব্বক্ষণ বাহির হইতেছে। এক বিঘা শস্যক্ষেত্রের বৃক্ষপত্র হইতে বর্ষে ২৫০০০ মণ জল

বহির্গত হয়,সেই পরিমাণ ভূমির উপর আকাশ হইতে তাহার অৰ্দ্ধেক পরিমাণ জল পড়িয়া থাকে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, বৃক্ষ সকল আকাশ হইতে যত জল পায়, তদপেক্ষা অধিক জল তাহাতে প্রত্যর্পণ করে। এই অতিরিক্ত জল বৃক্ষগণ জলাশয়াদি হইতে সংগ্রহ করে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, বৃক্ষ দ্বারাও জলের চক্রাবর্ত্ত গতি আশ্চর্য্যরূপে চলিতেছে।

জন্তু সকলও জল পান করিয়া কেবল উদরস্থ করিয়া রাখে তাহা নহে, তাহাদিগের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শ্বাস যন্ত্র হইতে এবং শরীরের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া বাষ্পাকারে জল বাহির হইতেছে। একজন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের শরীর হইতে এই জল প্রতিদিন এক সের পরিমাণে বহির্গত হয়, বৃহদাকার জন্তু সকল তাহাদিগের শরীরের পরিমাণানুসারে জল নিঃসারিত করে। এখন বিবেচনা কর পৃথিবী নিবাসী সমুদায় জন্তুর শরীর হইতে কত জল বাহির হয়?

৩য় রাসায়নিক কারণ। রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন গূঢ়তররূপে চলিতেছে, তেমনি অধিকতর আশ্চর্য্য। বৃক্ষশরীরের সূত্র সকলে জলের ভাগ অধিক। যখন বৃক্ষ মরিয়া গিয়া পচিতে থাকে, তখন যে জল ইহার শরীরে বদ্ধ ছিল, মুক্ত হইয়া বায়ুতে মিশ্রিত হয়। জন্তু-শরীরের বিষয়েও এইরূপ বলা যায়। জন্তুদিগের আহারীয় দ্রব্যের অধিকাংশ জলসিক্ত, যখন তাহাদিগের শরীরে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখন তাহাদিগের শ্বাসযন্ত্র হইতে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সেই জল বাহির হয়। অতএব দেখা যাইতেছে জলদ্বারা বৃক্ষ ও জীব শরীরের পুষ্টি সাধন হইতেছে এবং শরীরের ক্ষয়ের সঙ্গে তাহাই আবার বায়ু-মণ্ডলে গিয়া মিশিতেছে। জন্তুর নিঃশ্বাসের জলে বৃক্ষের পুষ্টি এবং বৃক্ষের নিঃশ্বাসের জলে জন্তুরও পুষ্টি সাধিত হইতেছে। এই সকল কার্য্য রাসায়নিক কারণে সংঘটিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে জলের চক্রাবর্ত্ত গতি প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি পলকে সম্পন্ন হইতেছে।

বামাগণের রচনা।

নিবেদন।

হে বঙ্গীয় ভগ্নীগণ! তোমরা যে কি প্রকার হীনাবস্থায় আছ, তাহা একবার দর্শন কর। তোমাদের মন যে কি ভয়ানক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া

ভাল হইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন কর। হায়! আমরা এক ঈশ্বরের পুত্র কন্যা হইয়া, কেন এত নীচাবস্থায় রহিয়াছি? ভগিনীগণ! একবার চেয়ে দেখ দেখি ভারতভূমির প্রিয় পুত্রেরা ও আমাদের সাধুভ্রাতারা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও ধর্ম্ম পথানুসরণে অগ্রসর হইয়াছেন। আর আমরা ভারতমাতার কন্যা হইয়া কত হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা প্রভৃতি কুক্রিয়ার রত থাকিয়া দিনাতিপাত করিতেছি। মলিন পঙ্কে ও গাঢ় অন্ধকারে আমাদের হৃদয় একবারে নিমগ্ন রহিয়াছে। দিনান্তে মঙ্গলময় পিতাকে ত আমরা একবার ডাকি না। হায়! আমরা কি অধম, যে ঈশ্বর হইতে আমরা সকল সুখ পাইয়াছি তাঁহাকেই ভুলিয়া মিথ্যা সাংসারিক সুখ সারজ্ঞানে তাহাতেই লিপ্ত রহিয়াছি। তাঁহাতে বঞ্চিত হইয়া আমরা কত অধর্ম্মাচরণ করিতেছি। ধর্ম্মভয় যাহার শরীরে না থাকে সেত অনায়াসেই সকল কর্ম্ম করিতে পারে। অপহরণ করিতে বা অন্য কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে তাহার মন কখন ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না। আর আমরা কতদিন বিদ্যাহীনা অধার্ম্মিকাবস্থায় কালযাপন করিব? কতদিনই বা আমাদের মন এমন অমাবস্যার নিশার ন্যায় অন্ধকারময় থাকিবে? আর পুরুষেরাই বা কতদিন এমন স্ত্রী লইয়া দুঃখে জ্বলিবেন? তাঁহারা আমাদিগকে ঘৃণা করেন, ও অবিশ্বাস করেন। অবিশ্বাসিনী জ্ঞানে তাঁহারা গোপনীয় কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করেন না। দেখ স্বামীরা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, ও সভা সমাজে বিশেষ আদর পাইতেছেন, কিন্তু ঘরেতে মূর্খ স্ত্রী লইয়া কতই ক্লেশ পাইতেছেন। তাঁহারা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মালাপ ও ভাল বিষয়ে কোন কথোপকথন করিতে পারেন না। কারণ ধর্ম্মবিষয়ক কথা মূর্খ স্ত্রীরা কিছুই বুঝিবে না। সুতরাং তাঁহারা স্ত্রীর সহিত কথা কহিয়াও সুখী হইতে পারেন না। যদি তাঁহারা স্ত্রী হইতে সুখ নিজে না পাইলেন, তবে পত্নীকে সুখী করিবেন কি করিয়া? হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে নারী জন্ম ধারণ করিয়া, পতিকে সুখী করিতে পারি না। যে সংসারে দম্পতীতে উত্তম ভালবাসা ও পবিত্র প্রণয় নাই, সে সংসার ত কখনই সুখের হইতে পারে না। অতএব ভগিনীগণ! আর আমরা এমত অবস্থায় থাকিব না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাহাতে

ভাল হইতে পারি, এস এমন চেষ্টা করি। একমনে ভাল হইবার জন্য চেষ্টা করিলে আমরা অবশ্যই ভাল হইতে পারিব, চেষ্টা ও যত্নে কি না হয়? আমরা যদি উত্তম লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া স্বভাব ও মন ভাল করিতে পারিতাম, তাহাহইলে স্বামীদের সৎপরামর্শ কখনই অবহেলা করিতাম না। ভগ্নীগণ! আর আমরা মূর্খানাম ধারণ করিয়া পশুমত থাকিব না। মাতারা মূর্খা বুদ্ধিহীনা বলিয়া এদেশের পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্তে শিক্ষিত হইলে মাতার কথা প্রায়ই অবহেলা করিয়া থাকেন, তাহার কারণ মাতারা উচিত বিবেচনা করিয়া কোন কথা বলিতে পারেন না। আরও অশিক্ষিতা মাতার দোষে অস্মদ্দেশের কত বালক যে শৈশব কালে মন্দ আচরণ শিক্ষা করিয়া উৎসন্ন গিয়াছে, তাহা ভাবিলে মন যারপর নাই দুঃখার্ণবে পতিত হয়। শিশুকালে মন্দ হইলে তাহাকে সহজে ভাল করা যায় না। এইরূপ বালকেরা অল্প বয়সে কুরীতি শিক্ষা করিয়া পরে ভয়ানক পাপ পথে যাইতেও তাহাদের কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ হয় না। বঙ্গভূমির পুত্র কন্যারা কতদিনে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিবে? আর কেহ স্থির থাকিও না। এইবার উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়াছে, চল সেই পথে সকল ভাই বোনে যাইয়া জীবন পবিত্র করি ও ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করি। হে সহোদরা সম বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ! দেখ ভিন্ন দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বিদ্যার গুণে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। তোমরাও তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যানুশীলন করিয়া স্বাধীনতা লাভ কর, ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। সকল স্ত্রীলোকের মন যদি জ্ঞান শশীর আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা নিজ নিজ সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত আনন্দোৎপাদন করিতে পারে তাহা বলা যায় না। বামাগণ বিদ্যাবতী হইলে পিতা মাতা স্বামী প্রভৃতি গুরুজন এবং সন্তান সন্ততি ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা করিতে সক্ষমা হয়। বিদ্যাশিক্ষার যে কত গুণ আর না শিক্ষার যে কত দোষ তাহা আর কি বলিব? প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই যদি বিদ্যাবতী হইয়া ধর্ম্মপথানুগামিনী হন, তবে দুঃখ ক্লেশ পরিবৃত এই ভূমণ্ডল যে কি প্রকার আনন্দের ধাম হয়, তাহা মনে উদয় হইলে অসীম আনন্দ

অনুভূত হয়। সেকালের লীলাবতী খনা প্রভৃতি মহিলাদের নাম অদ্যাপিও জাজল্যমান রহিয়াছে। আর আমরা কেন এত হীনাবস্থায় রহিয়াছি?

বিদ্যাবৃক্ষ।

যদি জগতে কল্পতরু কিছু থাকে, বিদ্যাই সেই কল্পতরু। এই বিদ্যা বৃক্ষের ফলভোগ করা অতিশয় আয়াসসাধ্য। ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সেই অমৃতময় ফলের রসাস্বাদন করিয়া সুখী হইয়া থাকেন। কারণ বহুসংখ্যক লোকই দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই বিদ্যাবৃক্ষের উচ্চতা, বিশালতা, এবং অসংখ্য শাখা প্রশাখা দর্শন করিয়া ইহার ফললাভ আশায় নিরাশ হইয়া ম্লান মুখে পশ্চাৎপদ হয়েন। কেহ কেহ বা এই বৃক্ষকে একেবারে দুরারোহ মনে করিয়া ভীত মনে দূরে পলায়ন করেন। আবার কেহ কেহ বিদ্যার ফলভোগে লোলুপ হইয়া বিদ্যা বৃক্ষারোহণে প্রবৃত্ত হন, পুনর্ব্বার, কিঞ্চিৎদূর আরোহণ করিতে না করিতেই অবসন্ন ও অসমর্থ হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হয়েন; কিন্তু যে ব্যক্তি একবার কায়মনঃপ্রাণে যত্ন করিয়া বিদ্যার অন্ততঃ একটি ফলও লাভ করিয়াছেন এবং তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন, তিনি আর কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারেন না।

আমি একদা এক উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম এবং এক নিকুঞ্জের শোভা সন্দর্শনে পরম পুলকিত হইতেছিলাম। সেই নিকুঞ্জের মধ্যভাগে একটি সুন্দর বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। সেই বৃক্ষ বহু শাখা প্রশাখায় এবং নানা প্রকার ফলে ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই বৃক্ষে অনেকানেক উপবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং দেখিলাম নানা প্রকার লতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অতি শোভমান হইয়া রহিয়াছে। আমি এই বৃক্ষকে নানা প্রকার সুমিষ্ট ফল ফুলে পরিপূর্ণ দেখিয়া উহার ফল সংগ্রহের নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম; কিন্তু দেখিলাম কঠোর পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য না করিয়া বৃক্ষারোহণ সম্ভবপর নহে। কারণ বৃক্ষের গুঁড়ি অতি স্থূল, বন্ধুর, এবং শাখা প্রশাখাদি না থাকায় আরোহণকারীর পক্ষে আশ্রয়হীন। এই বৃক্ষটি দেখিয়া বৃক্ষারোহণে অসমর্থ ও ফল সংগ্রহে নিরাশ হইয়াই আমার মনে বিদ্যাকে কল্প বৃক্ষ রূপে প্রতীতি জন্মে। তখনই বুঝিলাম কেন অধিকাংশ ব্যক্তি বিদ্যার প্রথম

সোপান দেখিয়াই ফিরিয়া যায়। তখন বুঝিলাম বিদ্যা শিক্ষার প্রথম অবস্থায় কেন এত কষ্ট হইয়া থাকে। ইহাও বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না কেন একবার ফল লাভের উপযোগী স্থানে উত্থিত হইলে লোকে আর সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে যেরূপ স্থূল, কর্কশ ও অবলম্বনহীন বৃক্ষারোহণে নিরতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ বিদ্যা কল্পতরুরও মূলারোহণে ক্লেশ হইয়া থাকে। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইলেই আরোহীর ক্লেশের লাঘব এবং সুখের সঞ্চার হইতে থাকে।

অতএব ভগ্নী গণ! যেন আমরা এই বৃক্ষ উপার্জ্জনের প্রাথমিক ক্লেশ দেখিয়া ভীত না হই। একবার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত না তাহার ফললাভ হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিব। যত্নে অবশ্যই রত্ন লাভ হইবে। শ্রীস, ম।

ঈশ্বর স্তোত্র।

তোমার মহিমা বল ভবে কেবা জানে।
তোমার অনন্ত শক্তি কেবা পায় ধ্যানে?
তোমার এ বিশ্ব বিভু হেরিয়া নয়নে।
বল কেবা পায় সংখ্যা ভেবে মনে মনে?
যখন যে দিকে যায় নয়ন আমার।
সেই দিকে দেখি তুমি সৃষ্টির আধার॥
জলে স্থলে নভে আমি যে দিকেতে চাই।
দয়া বরষণ তব দেখিবারে পাই॥
তোমার আজ্ঞাতে পিতা যত ঋতু গণ।
করিছে বৎসর ব্যাপি নিয়ত ভ্রমণ॥
চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি যত গ্রহগণ।
নীরবে করিছে তব আদেশ পালন॥
নিত্য নব তেজ রাশি বরষি ভূতলে।
নমিতেছে তব পদে অস্তগতি ছলে॥
আজ্ঞামাত্র ধায় মেঘ বারি বরষণে।

বলে 'জয় জগদীশ' গভীর গর্জ্জনে ॥
তব কায় সাধি নদী কুল কুল রবে।
তোমার মহিমা সদা প্রচারিছে ভবে ॥
রজনী প্রভাতে দেখি যত পক্ষী গণ।
মধুস্বরে করে তব মহিমা কীর্ত্তন ॥
ফুল মাঝে দেখি যত মধুকর গণ।
গুণ গুণ রবে করে তোমার পুজন ॥
ফল ভরে দেখি বৃক্ষ হয়ে নত শির।
প্রণমে চরণে তব ঝরে আঁখি নীর ॥
কিন্তু এই অভাগিনী ভ্রমে নিমগন।
একবারও তব নাম করে না স্মরণ ॥
সংসার মায়ায় তার মুগ্ধ সদা মন।
ভুলেও করে না কভু সত্য আলাপন ॥
সতত কাটিছে কাল বৃথা পাপ মতি।
একবারও ও চরণে করে না প্রণতি ॥
আসিয়া এ ভব মাঝে কিছু না হইল।
দীননাথ নামে মন কভু না মজিল ॥
পাপরূপ কুচিন্তায় হয়ে সদা রত।
বিষম বিষয়ে পড়ি হতেছে বিব্রত ॥
অনিত্য বস্তুতে ভুলে আছ ওরে মন।
চিনিলে না নিত্য ধনে জীবের জীবন ॥
একি হে মত্ততা তব একি হে অন্যায়।
স্তনমুখে কোলে শুয়ে ভুলে আছ মায় ॥
ছিছি ছিছি একি ভাব ওরে পাপ মন।
চেতন থাকিতে কেন হেন বিচেতন ?
এখনও সতর্ক হও মেল জ্ঞান আঁখি।
দেখ কত সুখ সেই পিতারে নিরখি ॥

অন্নপূর্ণা দেবী।

মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	মূল্য
গঙ্গাধর দাস ফেরোজপুর	২।/০
দুর্লভচন্দ্র সরকার কলিকাতা	১৷৵০
রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেণ্টরেল প্রভিন্স	২॥৵০
মথুরমোহন মুখো দেরাহুন	১।/০
রামরূপ ঘোষ কাণপুর	২।৵০
মতিলাল ঘোষ বহুবাজার	॥৶০
সুখময় মিত্র চেতলা	১।০
জগদীশচন্দ্র বসু কালিঘাট	১৲
জ্ঞানদীপিকা সভা গড়বেতা	১॥০
শিবচন্দ্র বসু লাহোর	২॥৶০
উপেন্দ্রচন্দ্র বসু চক্রবেড়	২।০
প্রিয়নাথ মল্লিক ভবানীপুর	২।০
বসন্তকুমার গুহ বহুবাজার	২।০
প্রসন্নকুমার বন্দ্যো কলিকাতা	২।০
বিশ্বেশ্বরী দেব্যাচৌধুরাণী গৌরীপুর	॥/০
দুর্গাচরণ বসু শ্যামপুকুর	২৲
কৈলাসচন্দ্র রায় দেহড়াদুন	২॥৵০
নিতাইলাল নন্দী কলুটোলা	১৶০
পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যো বালেশ্বর	২৷৵০
শ্রীকরিমন্নেচ্ছা খাঁ সখিচৌধুরাণী টাঙ্গাইল	২॥৵০
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো তালতলা	।০
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো কালীঘাট	২।০
শশীভূষণ বিশ্বাস পটলডাঙ্গা	২।০
বিশ্বম্ভর ঘোষ বোটানিকেল গার্ডেন	৬॥/০
বিজয়গোপাল মুখো শ্যামপুকুর	১।০
ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মেছুয়াবাজার	১০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা অন্তরের পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যাঁহার গুণের শেষ নাই, যাঁহার সুযশ সমুদায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যাঁহার সৎকীর্ত্তিতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার দেশহিতৈষিতা, বিদ্যোৎসাহিতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীর চিত্ত সৎপথে উত্তেজিত করিতেছে, যাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্বেতদ্বীপবাসিনী ভারতেশ্বরী মুক্তহস্তে উচ্চ উচ্চ উপাধিদান করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না, সেই মহাত্মা দীনবৎসলা ভারত নারীকুল শিরোভূষণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০০ টাকা দান করিয়া মুমূর্ষু বামাবোধিনীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। বামাবোধিনী যতদিন জীবিতা থাকিবেন, তাঁহার এ মহোপকার বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

বামাবোধিনী সম্পাদক।

Registered No. 97.